শ

চেতনায় সমাজচিন্তন

১৩৯৯

জাতীয় সমাজচিন্তন

No. 1-2 , 1992

No. 8-9, 11 , 1994

...th best comp... ...om

Gram : OPEN FORGE (CAL)
Telex No. 5111 FISL IN

Factory : 65-5838
Office : 30-4904, 30-4836

FORGINGS (INDIA) IRON & STEEL (P) LTD.

(Open End Forgings of All Qualities of Carbon & Alloy Steels as per Customers Requirements & Drawings Including Heat Treatment & Ultrasonic Testing)

City Office
P-38 India Exchange Place
Arun Chambers, 6th Floor
Calcutta-700 001

Regd. Office & Factory
62/D/2 J. N. Mukherjee Road
Ghusury, Howrah

জাতীয় সমন্বয়

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৯৯ ☐ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯২ ☐ সপ্তম বর্ষ
১ম ও ২য় সংখ্যা ☐ পাঁচ টাকা

সূচীপত্র

সমকালীন ইতিহাস	নিশীথরঞ্জন রায়	
কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠা	সন্তোষ কুমার দে	
নিবন্ধ :		
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বাঙালী : নীরদ সি. চৌধুরী	ডঃ অশোক কুণ্ডু	
মহাভারতে দুর্গার কথা	সুধীর কুমার মিত্র	
যুক্তি-বিজ্ঞান-ধর্ম-আধ্যাত্মিকতা	ডঃ অরুণ নীল	
ভয়ঙ্কর সুন্দর নায়েগ্রা	ডঃ নিখিল কর	
কলকাতার আদিকালী : করুণাময়ী মা	বিমল কুমার ভট্টাচার্য্য	
কবিতাগুচ্ছ : তাঁবু ☐ ব্রত চক্রবর্তী ৩৭ ; অমরাবতীর দুটি ফুল ☐ পলাশ মিত্র ৩৭ ; এক মুহূর্ত ☐ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ৩৭ তপস্বিনী ☐ মধুর দাশগুপ্ত ৩৮ : জীবন দু'রেছে এক নদী ☐ পুলক রায় ৩৮ ; প্রীষ্মের আকাশ ☐ অনুরাধা মহাপাত্র ৩৯ সময় ☐ গৌতম মুখোপাধ্যায় ৩৯ ; এসবে কি এসে যায় ☐ যখন দত্ত ৪০ ; আমিও নেতা, তুমিও নেতা ☐ মণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ৪০ ; অপরাধ ☐ তাপস মিত্র ৪১ ; সূর্য অস্তাচলে ☐ পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১ ; অজানায় ☐ আনন্দ দাশগুপ্ত ৪১ , অন্ধকারে যখন ☐ কল্যাণী মিত্র ৪২ ; তবুও আমরা ☐ কমল কুমার রায় ৪২		
গল্প : ঢেউয়ের পরে ঢেউ	অর্ধেন্দু বিশ্বাস	৪৩
ক্যালেণ্ডার	সন্তোষ আচার্য	৫১
রহস্য গল্প : দুপুরের রহস্য	অমিতাভ চক্রবর্তী	৫৭
জীবনটা যে রকম	বিজয়া মুখোপাধ্যায়	৬৩
ভ্রমণ কাহিনী : অপরূপা পোয়ার : কয়েক দিন	পল্লব মিত্র	৬৭

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ☐ ডঃ অর্ধেন্দু বিশ্বাস
সহ-সম্পাদক ☐ পল্লব মিত্র
সম্পাদক ☐ শঙ্কর কুমার সান্যাল
প্রকাশিকা ☐ শিখা সান্যাল
মুদ্রক ☐ সুনীল কুমার দে, প্রিন্ট লাইন, ৬১ নস্কর পাড়া রোড, ঘুসুড়ী, হাওড়া-৭১১ ১০৭
কার্যালয় ☐ ১৭/৩ নস্কর পাড়া রোড, ঘুসুড়ী, হাওড়া-৭১১১০৭ ☐ ফোন : ৬৫-৬১৬১, ৬৫-৬৬২১
শাখা কার্যালয় ☐ বেলগাছিয়া ভিলা, ব্লক-৩৯, ফ্ল্যাট-৬, কলিকাতা-৭০০০৩৭ ☐ ফোন : ৩৬-৩৫১১

With best compliments from :

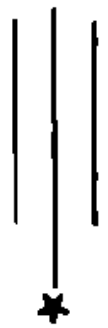

HANSA UDYOG

Timber Merchant & General Order
Supplier

138 BIPLABI RASH BEHARI BOSE ROAD
CALCUTTA-700 001

Phone : 23-1442

আমাদের কথা

শারদোৎসব

নদীর তীরে কাশের বনে যেই শুভ্র ফুলের রাশি ফুটিয়া উঠিল, আকাশের নীলে আনাগোনা করিতে লাগিল শুভ্র লঘু মেঘের দল আর সন্ধ্যাবেলায় আঙিনার শাল গাছটিতে ফুটিয়া উঠিল সহস্র সহস্র শুভ্র সেফালি ফুল, অমনি দিকে দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িল এই কথাটি—বিশ্বজনীন শারদলক্ষ্মীদেবী অম্বিকা আসিতেছেন, আর তৎক্ষণাৎ মরমী গায়কের সুমধুর কণ্ঠের আগমনী গানের সুরে সুরে বাংলার পথঘাট, গ্রাম শহর একেবারে মুখরিত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল।

সাম্প্রতিক কালে বাঙালীর প্রাণশক্তির দেবীর আগমনীর এই গৌরচন্দ্রিকার স্রোতটি শুষ্ক হইয়া ক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাঙালীর হৃদয় আজ নীলাকাশে লঘু মেঘের খোঁজ করে না, নদীতীরে কাশের শুভ্র বাতাসে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল কিনা জানিতে চাহে না এবং আঙিনার সেফালি গাছটির কি গতি হইল তাহারও খোঁজ রাখে না। আনন্দপরিপূরিত দেবী-আগমনের সেই সুগন্ধী পরিবেশের অনুভূতিটি আজ অতীতের স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

তাই বলিয়া দেবী পূজার ভাটা পড়িয়াছে এমত মনে করিবার কোন কারণ নাই। বরং দেবীপূজাকে কেন্দ্র করিয়া উগ্র আনন্দের ঘটাবৃত্তির পরিমাণ সম্প্রতি এমন হারে বাড়িয়াছে যাহা সুরুচির সীমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সমকালীন জীবনের আর পাঁচটি অঙ্গভীর উগ্র আনন্দের সহিত শারদোৎসবের শুচিস্নিগ্ধ ভাবটিকে মিলাইয়া ফেলিয়া সর্বাংশে উদ্যোক্তরা দেবীপূজার ভক্তিভাব-গাম্ভীর্যকে একেবারেই লঘু করিয়া ফেলিয়াছে। বিশেষ করিয়া বারোয়ারী দেবীপূজার ক্ষেত্রটি বর্তমানে এই অবস্থারই প্রতিচ্ছবি।

পরিপূর্ণ ভক্তিতন্ময়তার দ্বারা দেবীপূজার আয়োজন যে একেবারেই সৃষ্ট হয় না, তাহা নহে। বিশেষ করিয়া পারিবারিক পূজাগুলির উদ্যোক্তরা বংশ-পরম্পরায় আজও শুদ্ধ-ভক্তি পরিবেশটিকে রক্ষা করিয়া চলিতেছেন।

যাহা হউক, সমস্ত কিছু মিলিয়া পূজার দিন কয়টি সুস্থ আনন্দের পরিবেশে সকলের জীবনে পরিপূর্ণ সার্থকতায় মূর্ত হইয়া উঠুক, মনেপ্রাণে আমরা আজ ইহাই কামনা করিতেছি এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের পত্রিকার শারদ-সংখ্যার স্বল্প কয়েকটি রচনার অর্ঘ্যে আমরা শারদলক্ষ্মী জগজ্জননীকে বরণ করিতেছি।
□ অ. বি. □

নানা ভাষা নানা মত
নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ
মিলন মহান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা : ১৩১৪ (১৪)। হাওড়া জেলা তথ্য। তারিখ—১৫।৩।৯২

সারদীয়া পূজার অভিনন্দন গ্রহণ করুন :—
ব্যবহার করুন বুড়ীমার দেশলাই
নকল হইতে সাবধান
বুড়ীমার ফায়ার ওয়ার্কস, বেলুড়, হাওড়া
একমাত্র পরিবেশক
তিনকড়ি বসাক এণ্ড সন্স
৩২ পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

সমকালীন ইতিহাস

ডঃ নিশীথরঞ্জন রায়

যে দেশের ইতিহাস যতো প্রাচীন, সেই দেশের ইতিহাসের গবেষণাক্ষেত্রের পরিসর ততো বেশি। ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীনতম দেশগুলির অন্যতম। মানব-অধ্যুষিত যে-সব অঞ্চলে আদি সভ্যতার উন্মেষ ও প্রসার ঘটেছিল তাদের মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান নির্দেশিত হয়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রটি বিশালায়তন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক-কাল পর্যন্ত তার বিস্তার।

স্বভাবতঃই আমাদের গবেষক ও প্রবন্ধকারদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এক একটি যুগের প্রতি—কারো গবেষণার ক্ষেত্র প্রাগৈতিহাসিক এবং প্রাচীন যুগ, কারও মধ্যযুগ, কেউ বা বেছে নিয়েছেন বর্তমান যুগটিকে। একটি বিশেষ যুগ-বিভাগের মধ্যে আমরা যেতে নেওয়া সম্ভব এক একটি বিশেষ ক্ষেত্র, যেমন ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, রাজবৃত্ত, সংস্কৃতি, বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক, ব্যবসায় বাণিজ্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি। এক এক যুগের সূত্রও বিভিন্ন—প্রাগৈতিহাসিক এবং প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উপাদান, পুরাতত্ত্ব, দেশী-বিদেশী সাহিত্য, শিলালিপি, মুদ্রা ইত্যাদি। মধ্যযুগের ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাবে বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যে, শিলালিপি, মুদ্রা ইত্যাদি উপাদানে। আধুনিক যুগের ইতিহাসের প্রধান উপাদান কাগজে দলিল, নথিপত্র, চিঠি, পরিবেদন ইত্যাদি। সময় সীমা অতিক্রম করে ইতিহাস যতো এগিয়ে যাবে, ততই উপাদানের বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্য বেড়ে যাবে। প্রাগৈতিহাসিক এবং প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উপকরণ তুলনামূলকভাবে স্বল্পায়তন। সুতরাং একদিকে নতুন তথ্য আবিষ্কারের ভিত্তিতে গবেষণা। অন্যদিকে পুরাণো তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের পুনর্মূল্যায়ন প্রাচীন ইতিহাস-গবেষকদের প্রধান সম্বল। অন্য যুগের ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্র তুলনায় প্রশস্ততর, কারণ প্রাচীন যুগের তুলনায় সাহিত্যের উপাদানের পরিমাণই শুধু বেশি নয়, তাদাগত সম্ভারোহের বৈচিত্র্যও অনেক বেশি। আধুনিক যুগের ইতিহাসে পুরাতত্ত্বের স্থান স্বল্প-পরিসর হলেও কাগজে উপাদানের বৈচিত্র্য ও পরিমাণ আগের দু'টি যুগের উপাদানকে বহু পরিমাণে ছাড়িয়ে গেছে। এই বিপুল উপাদান সম্ভারের সীমা পরিসীমা নেই।

আধুনিক যুগের অজস্রধারি সংগৃহীত উপাদান ইতিমধ্যেই বিশালায়তন ধারণ করলেও এই আয়তন বিশালতর হতে পারে—এমনটি মনে করা খুব স্বাভাবিক। উপাদান সংগ্রহের কাজ এখনও অসমাপ্ত। তাছাড়া বহু কাগজে উপাদান সংগৃহীত হলেও তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থাটি নেহাৎই দুর্বল। সংগ্রহশালায় ক্যাটালোগ-চিহ্নিত হয়ে রয়েছে বহু কাগজে উপাদান যা সংরক্ষণোপযোগী ব্যবস্থার অভাবে অব্যবহারযোগ্য হয়ে যাচ্ছে—এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই।

প্রেক্ষাগার অথবা সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়নি, ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এমনি ধরনের উপাদান-সংখ্যাও নগণ্য নয়। একদিকে সংগৃহীত উপাদানের ব্যবহারযোগ্যতার অভাব, অন্যদিকে অজস্রধারি অসংগৃহীত উপাদান-তালিকার বিশালতা—দুই মিলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রহণ

এবং বর্জনের ব্যাপারে আমাদের ইতিহাস-চর্চার পক্ষে সৃষ্টি করেছে প্রবল অন্তরায়। সময় যতো এগিয়ে যাচ্ছে উপাদান-সংক্রান্ত সমস্যার তীব্রতাও ততো বাড়ছে।

এমনি ধরনের অভিযোগ বহু কালের এবং বহু জনের। তবু প্রতিকারের জন্য যথোপযুক্ত প্রয়াসের অভাব যথা পূর্বং তথা পরং। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ বিষয়ে উদ্যোগী হবেন—এই আশা আজ দুরাশা বলে প্রমাণিত হয়েছে। সংরক্ষণের উপযোগী ব্যবস্থার অভাব যে কতোখানি মারাত্মক হতে পারে তার দৃষ্টান্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনাদৃত গ্রন্থাগারটি। বেসরকারী পুরাণো গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা একই রকম, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও খারাপ।

আধুনিক যুগের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় সমকালীন যুগ। সমকালীন যুগ বলতে সাধারণভাবে বোঝা যায় আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের ঘটনা থেকে আজকের ঘটনার পরিধি। অবশ্য এই ৪০ বছরের সময় সীমাটি বাড়ানো কমানো যেতে পারে ইতিহাসের ধারাবাহিকতার তাগাদায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে সমকালীন ইতিহাসের অনেকখানিই আজও অলিখিত। 'জার্নাল' নামে পরিচিত সাহিত্যে সমকালীন ঘটনা অথবা ব্যক্তি বিশেষের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি চোখে পড়ে। কিন্তু বিস্তৃত ইতিহাসের ধরণধারে তার প্রবেশাধিকার এখনও সঙ্কুচিত। এই একটি কারণ বোধ করি উপাদানের অপ্রতুলতা, সংবাদপত্রে পরিবেশিত তথ্য, সরকারী কিম্বা আধ-সরকারী বিভাগের রিপোর্ট, পুলিশী অথবা প্রশাসনিক সূত্রে পাওয়া তথ্য, বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদন, চিঠিপত্র ইত্যাদি যুগ কাছাকাছি সময়ের হলেও তা সংগৃহীত হয়নি যথাযথভাবে। তাছাড়া এই সব সূত্র বহু ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী। কোন কোন সূত্র রক্ষিত হলেও গবেষকদের কাছে তা সহজলভ্য নয়। তদুপরি আঞ্চলিক সূত্রের বহু ক্ষেত্রে রয়েছে ভাষার বিভিন্নতা। পশ্চিমবঙ্গের উৎসাহী গবেষক India Office Library & Record Room অথবা American Library Congress-এ রক্ষিত সূত্রের হদিস যতো সহজে পেতে পারেন এবং তার সদ্ব্যবহার করতে পারে তামিল সূত্র অথবা মারাঠী কিম্বা গুজরাতী সূত্র তার কাছে ততো সহজলভ্য নয়। আর যদি তা সংগ্রহ করা সম্ভবও হয়, তাহলে তা কাজে লাগানো প্রায় অসম্ভবের নামান্তর। কারণ, বঙ্গ ভাষাভাষী গবেষক তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, মারাঠী, গুজরাতী, পাঞ্জাবী, ওড়িশী, উর্দু, আরবী, ফার্সি, এ ছাড়া ওলন্দাজ, দিনেমার, পর্তুগীজ কিম্বা জার্মান ভাষা আয়ত্ত করে এই সব বিভিন্ন ভাষায় লেখা রকমারী সূত্র তার গবেষণায় ব্যবহার করেন—এমনটি আশা করা অবান্তর। যা সম্ভব তা হলো এই যে যদি অন্ততঃ গত দশ বছরের মধ্যে তথ্যভিত্তিক সমীক্ষা চালনার ব্যবস্থা থাকতো,তাহলে কোন একটি বিষয়ে যেমন ইতিহাস গবেষণার বিভিন্ন প্রাদেশিক অথবা আঞ্চলিক ভাষায় কী কী গবেষণামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কোন কোন সূত্রের উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে গবেষণা-গ্রন্থ, এই সব গ্রন্থের মধ্যে এমন একটি, দুটি অথবা ততোধিক সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে কিনা যা শুধু একটি বিশেষ আঞ্চলিক ভাষায় লেখা, অন্য ভাষায় তা রূপান্তরিত হয়নি। কী ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন গ্রন্থকার। এই কটি নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করার দায়িত্বভার যদি অর্পিত হতো কোন একটি দুটি সংস্থার উপর তাহলে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের ভিত্তিতে আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রটি ঊর্ধ্বতর হবার সুযোগ পেতো।

সমকালীন ইতিহাস রচনা নিয়ে আর একটি বাধা—ক্রমবর্ধমান রাজনীতির প্রভাব—একই ঘটনার বিভিন্ন ভাষ্য। এর ফলে নির্ভেজাল সত্য উদ্ঘাটন যার লক্ষ্য তিনি অর্থাৎ বিবেকবান এবং

সত্যানুসন্ধানী নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক তার দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত হবেন নিঃসন্দেহে। তবু এরই মধ্যে তাকে সত্য সন্ধানের দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে হবে—কাজটি নিঃসন্দেহে দুরূহ কিন্তু সাধ্যের অতীত নয়। সমকালীন ইতিহাসে এখন পর্যন্ত আমরা ঢুলে পড়ছি জার্নালে, কিম্বা রম্যরচনায়, অথবা রাজনীতি সর্বস্ব প্রতিবেদনে। আশা করবো Documentation-এর কাজটি যাতে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা সম্ভব হতে পারে। যেমন ধরা যাক বিরাষ্ট্রিয়ের আন্দোলন, যার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচনার অপেক্ষায়। দু'একটি রাজ্য এই আন্দোলন সংক্রান্ত মূল প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা হয়নি। Documentation-এর প্রথম স্তর Indexing। আমাদের দেশের স্বজ্জন সংবাদ-পত্রগুলিও এ সম্পর্কে উদাসীন। আগে Annual Register নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো, এখন তা হয় না ; অথচ সংবাদপত্রগুলি তাদের তুলনায় আজ অনেক বেশি উন্নত। Oral History আমাদের দেশে এখনও উপেক্ষিত। কোন কোনও সংস্থা এ বিষয়ে উদ্যোগী হলেও মাঝপথে তারা তাদের উদ্যোগ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে সরকারী অর্থানুকূল্যের অভাবে। ৪২-এর পর থেকে ইতিমধ্যে ৩০ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে, অথচ সমকালীন ইতিহাসে এই একান্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি এখনও অবহেলিত। পাশ্চাত্য দেশের সমকালীন ইতিহাসের চর্চা দেখে আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু আমরা আমাদের সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে এখনও নির্বিকার। '৪২ সাল নিয়ে যেসব রচনা এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে প্রচারধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে অসমর্থিত সংবাদ এবং নিছক স্থান লাভ করেছে—তার ফলে তথ্যভিত্তিক নিরপেক্ষ সমকালীন ইতিহাস এখনও আমাদের নাগালের বাইরে। Documentation সম্পর্কে এখনও আমরা যদি উদাসীন থাকি, তাহলে আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সমকালীন ইতিহাসের অপাঙ্‌ক্তেয়ই থেকে যাবে।

□

With Best Compliments from

Chhaparia Brothers

109/2 GIRISH GHOSH ROAD
BELUR MATH
HOWRAH-711 202

কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠা

সন্তোষ কুমার দে

নিউ ইয়র্কে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্রে একবার শারদীয় মহাঅষ্টমীতে মঠাধ্যক্ষ স্বামীজির ভাষণ শুনতে গিয়ে একজন বর্ষীয়ান আমেরিকান ভক্তের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তিনি ভারতবর্ষে এসে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, কামারপুকুর, জয়রামবাটি সব ঘুরে দেখেছেন, কিন্তু দক্ষিণভারতে কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ শিলায় প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিটির পারিপার্শ্বিকের উন্মুক্ত সমুদ্রের পরিবেশ তাঁকে সবচেয়ে অভিভূত করেছে।

সুদূর দক্ষিণে কন্যাকুমারীতে আমাদের যাতায়াত কম। বিবেকানন্দ শিলায় প্রতিষ্ঠিত স্বামীজির স্মৃতিমন্দিরটির স্থাপনে মারাঠী সন্ন্যাসী একনাথ রানাডের দুরূহ প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে একজন বাঙালী মনীষীর সহায়তাই যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এ খবরও বিশেষ প্রচারিত হয়নি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর নিতান্ত শোকবিহ্বল অবস্থায় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে সে কাহিনী শুনিয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ, প্রখ্যাত সাংবাদিক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। ইন্দিরা-নিধনের অব্যবহিত পরে ১১ নভেম্বর ১৯৮৪ তারিখে 'রবিবাসর' সাহিত্যসভার এক অনুষ্ঠান আহ্বান করেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর রাসবিহারী এভিনিউ-এর বাসভবনে রবিবাসরের প্রবীণ সদস্য চপলাকান্তই ছিলেন একমাত্র বক্তা। স্বাধীনতালাভের অনেক আগে থেকেই সাংবাদিক হিসাবে চপলাকান্ত মতিলাল নেহরু ও জওহরলাল নেহরুর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। সেই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয় যখন চপলাকান্ত কংগ্রেস প্রার্থীরূপে পর পর দুইবার পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবেও জওহরলাল এবং পরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, উভয়ের নিকটই তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। ইন্দিরার উদার চরিত্রের কথা বলতে গিয়েই তিনি বলেছিলেন, কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল একমাত্র ইন্দিরার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলে। আর সে ব্যাপারটা যে ঘটেছিল চপলাকান্তের ঐকান্তিক চেষ্টায়, তা আমরা জানতে পারি তখনকার পরিস্থিতির কথা শুনলে। চপলাকান্ত নিজে অবশ্য সে কৃতিত্বের বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন।

সারা ভারত ভ্রমণ করে স্বামী বিবেকানন্দ যখন কন্যাকুমারীতে পৌঁছান, সেখানে সমুদ্রতীরের অনতি দূরে একটি জনবসতিশূন্য ছোট পাহাড়ের অদ্ভুতনীয় নৈসর্গিক শোভা তাঁকে এতই মুগ্ধ করে যে তিনি ঢেউয়ের দোলা দিয়ে সাঁতরে পাহাড়ের পাদদেশে চলে যান এবং দেখেন, প্রায় গোটা শিলাটি জুড়ে এক বৃহৎ পদচিহ্ন খোদাই করা। যাকে লোকে বলত—কুমারী দেবীর পদচিহ্ন। পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠবার পথ। চূড়ায় চড়ে দেখেন, সেখানে কখনও কোন মন্দির ছিল, তার কিছু ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে।

ঐ নির্জন চূড়ায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে স্বামীজি সাগর পারে যাওয়ার প্রত্যাদেশ পান। যে ক'টি দিন স্বামীজি কন্যাকুমারীতে ছিলেন, রোজ ঐ পাহাড়ে ধ্যান করতে যেতেন। স্বামীজির

নাম যখন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল তখন তাঁর অগণিত ভক্ত ঐ শিলাটির নাম রাখে 'বিবেকানন্দ শিলা' (Vivekananda Rock)। নামটি তারা পাহাড়ের গায়ে লিখেও দেয়।

স্বামীজির ঐকান্তিক অনুরাগী মারাঠী সন্ন্যাসী একনাথ রানাডে ঐ পাহাড়ের নৈসর্গিক শোভায় অভিভূত হন এবং পাহাড় চূড়ায় স্বামীজির একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। কিন্তু তা করতে হলে দরকার রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতা। আর দরকার প্রভূত পরিমাণ অর্থ। এর কোন কিছুই তখন রানাডের কাছে ছিল না।

রানাডে ছিলেন এক অদম্য কর্মী, অতুলনীয় সংগঠক। তিনি তাঁর প্রস্তাবটি ছাপিয়ে প্রচার করে জনমত গঠন করতে লাগলেন এবং প্রস্তাবটি পার্লামেন্টে তুলবার উদ্দেশ্যে দিল্লী গেলেন, যাতে সাংসদদের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁদের ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝিয়ে তাঁদের দ্বারা প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপন করতে পারেন।

কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটি করে তোলা কঠিন হল। তাঁকে পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করবার অনুমতি দিল না পুলিশ, একনাথ রানাডে কোন সময়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এই অভিযোগে।

অসহায় অবস্থায় রানাডে যখন দিল্লীতে ঘুরছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে একজন মারাঠী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের দেখা হয়। তিনি তখন দিল্লীতে নিখিল ভারত সংস্কৃত সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। ঐ সম্মেলন তখনও দিল্লীতে চলছিল। চপলাকান্ত ঐ সংস্কৃত সম্মেলনের একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন, মারাঠী পণ্ডিতটি তাঁকে তাই চিনতেন। চপলাবাবু যে একজন এম. পি. তাও তিনি জানতেন। তাই রানাডেকে সঙ্গে করে তিনি চপলাবাবুর বাসস্থানে এম. পি-দের কোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন ও রানাডেকে চপলাবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

চপলাকান্ত আজন্ম উত্তর কলকাতার অধিবাসী এবং স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। একজন মারাঠী সন্ন্যাসী স্বামীজির মূর্তি কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ শিলায় প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন শুনে চপলাকান্তও বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠলেন। রানাডেকে তিনি নিজের অতিথি হিসাবে সঙ্গে নিয়ে দর্শকের টিকিট করিয়ে পার্লামেন্ট ভবনে নিয়ে গেলেন। সেখানে বহু এম. পি-র সঙ্গে তিনিই রানাডের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা সব শুনে রানাডেকে পরামর্শ দিলেন, বিষয়টি লোকসভায় প্রস্তাব করবার আগে যদি মাদ্রাজ রাজ্যসভার অনুমোদন আনা যায় তা হলে সুবিধা হবে। রানাডে তাই চলে গেলেন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্ত বৎসলমের কাছে। ভক্ত বৎসলম কিন্তু রানাডের প্রস্তাবে রাজি হলেন না। বললেন, কন্যাকুমারী অঞ্চল আগে কেরল সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল, সম্প্রতি রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য তা মাদ্রাজ সরকারের আওতায় এসেছে বটে কিন্তু এখনকার কোন ব্যাপার নিয়ে তিনি কোন আন্দোলন ঘটাতে দেবেন না। সমুদ্র বক্ষে মূর্তি প্রতিষ্ঠা তো অসম্ভব।

প্রচেষ্টায় বিফল হয়ে রানাডে দিল্লীতে চপলাবাবুর সঙ্গে দেখা করলে চপলাবাবু বললেন, হুমায়ুন কবির, কেন্দ্রের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমন্ত্রী। পণ্ডিত মানুষ, আশা করা যায় বিষয়টি তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করবেন। তাঁকে প্রস্তাবটি দেবার জন্য রানাডে মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে গেলেন। অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হল কিন্তু হুমায়ুন কবিরও বললেন—ওখানে স্মারকমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলে পরিবেশের শোভা নষ্ট হবে।

রানাডে ঘরে ফিরে তাঁদের দুজনের দীর্ঘ আলোচনা অত্যন্ত সাবলীল ইংরাজিতে লিখে পরিচ্ছন্নভাবে টাইপ করিয়ে পরদিনই কবির সাহেবের নিকট নিয়ে গেলে তিনি খুশী হয়ে বিষয়টি সযত্নে পড়ে মন্তব্য লিখলেন—'যদিও আমি প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারছি না, কিন্তু আমি শ্রীযুক্ত রানাডের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি।'

ঐ আলোচনার স্বাক্ষরিত বিবরণটি পড়ে কয়েকজন সাংসদ তা লোকসভায় পেশ করতে সম্মত হলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী তাঁর বিরোধিতা করে তাঁর পূর্বোক্ত মন্তব্যই জোরালো ভাষায় বললেন—আশা করা গিয়েছিল, কংগ্রেসের বিরোধিতা করাই যাদের নীতি সেই বামপন্থীরা নিশ্চয়ই প্রস্তাবটির সমর্থন করবেন। কিন্তু কার্যকালে তখনকার অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির সংসদীয় মুখপাত্র অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে তা নাকচ করে দিলেন।

লোকসভাতেও যখন প্রস্তাবটি গৃহীত হল না তখন রানাডে একেবারে ভেঙে পড়লেন বলা চলে। চপলাবাবু তাঁর সেই চরম হতাশার সময়ে মনে বল দিতে বললেন—এখন একমাত্র উপায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রার্থনা জানানো। তিনি যদি বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন তবে হয়তো কিছু হলেও হতে পারে।

চপলাবাবুই সেই আবেদনপত্র লিখে রানাডেকে সঙ্গে করে কয়েকজন এম. পি-কে দিয়ে তাতে স্বাক্ষর করালেন। মহারাণী গায়ত্রীদেবী এবং কেশবদেব মালব্য স্বাক্ষর করলেন। চপলাকান্ত তো করলেনই। কৃষ্ণ মেনন বললেন, তিনি সই করতে চান না, তবে যথাস্থানে যা বলবার বলবেন এবং যাতে প্রার্থনা পূরণ হয় তার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন।

এবার চপলাকান্তের অগ্নিপরীক্ষা। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে তাঁর ঠাকুরদাদার আমল থেকে চিনতেন, বাবার প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলেও দেখেছেন, এখনও লোকসভায় কংগ্রেস থেকে নিয়মিত দেখেন। চপলাকান্ত কখনও কোন ব্যক্তিগত আবেদন ইন্দিরা গান্ধীকে জানাতে যাননি। যে বিষয় লোকসভায় গৃহীত হয়নি তার সম্পর্কে বিবেচনার অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া ইন্দিরা পছন্দ করবেন কিনা তা নিয়েও মানসিক দ্বন্দ্ব কম ছিল না। কিন্তু একরকম মরীয়া হয়েই চপলাকান্ত প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন এবং অচিরেই সাক্ষাতের অনুমতি পেলেন। ইন্দিরা চপলাবাবুর মুখে ব্যাপারটি শুনলেন এবং আবেদনটিও আগাগোড়া সবটা খুটিয়ে পড়ে চপলাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বিষয়ে আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন।

চপলাবাবু বললেন—আপনি অনুগ্রহ করে ভক্ত বৎসলমকে তাঁর আপত্তি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করলে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিমন্ত্রীকে একটু বুঝিয়ে বললে সহজেই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ইন্দিরা সহাস্যে বললেন—ভক্ত বৎসলমকে চিঠিখানি আপনি লিখে আনুন, আমি আর যা করবার করছি।

চপলাবাবু প্রধানমন্ত্রীর কক্ষ হতে বেরিয়ে প্রতীক্ষারত রানাডেকে নিয়ে ঘরে ফিরলেন এবং দু'জনে পরামর্শ করে ভক্ত বৎসলমকে প্রধানমন্ত্রীর জবানীতে একখানি অনুরোধপত্র লিখে টাইপ করিয়ে পরদিনই আবার শ্রীমতী ইন্দিরার অফিসে গেলেন। ইন্দিরা চিঠিখানি সযত্নে পড়ে দেখে প্রতিটি কপিতে স্বাক্ষর করে দিলেন, একটি অক্ষরও কাটলেন না, এমনকি কোন বাক্য পরিবর্তন করলেন না।

চিঠির প্রথম কপি ইন্দিরা নিজের কাছে রাখলেন, সরকারি ডাকে সরাসরি ভক্ত বৎসলমকে পাঠাবেন বলে, এক কপি চপলাবাবুকে দিয়ে বললেন, রানাডেকে দিয়ে ঐ চিঠি নিয়ে ভক্ত বৎসলমের সঙ্গে দেখা করতে। বাকি কপি অফিসে জমা হল।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাঞ্ছিত পত্র পেয়েই ভক্ত বৎসলম শুধু তাঁর আপত্তি প্রত্যাহার করলেন না, মাদ্রাজ সরকারের পক্ষ হতে যা যা সহায়তা প্রয়োজন সবই করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তবে রানাডের সঙ্গে চপলাবাবুর আলোচনা হয়েছিল, বিবেকানন্দ শিলার চূড়ায় স্বামীজির একটি বিরাট পরিব্রাজক মূর্তি প্রতিষ্ঠার। পরণে গৈরিক বসন, কাঁধে বিলম্বিত সন্ন্যাসীর উত্তরীয়, হাতে এক দীর্ঘ দণ্ড। দণ্ডের মাথায় থাকবে একটি উজ্জ্বল আলো—যা রাতে জ্বললে সমগ্র মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আদর্শ ছিল নিউ ইয়র্কে এলিস দ্বীপে উচ্চ পাদপীঠে প্রতিষ্ঠিত বিশাল স্বাধীনতার নারীমূর্তিটি (Statue of Liberty)। ভক্ত বৎসলম বললেন—তেমনভাবে খোলা আকাশের তলায় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও স্থানীয় দুষ্কৃতীদের সম্ভাব্য বিরোধিতার অত্যাচার হতে মূর্তি রক্ষা করা কঠিন হবে। বরং একটি মন্দির গঠন করে তার মধ্যে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলে তা রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হবে। রানাডে ও চপলাবাবু ভক্ত বৎসলমের প্রস্তাব গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। পরে প্রধানমন্ত্রীকে জানালে তিনিও তাতেই সম্মতি জানান।

কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি ও সহায়তার হাত বাড়িয়ে কাজটি ত্বরান্বিত করতে উৎসাহ দিলেন। সিংহবিক্রমে রানাডে কর্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শুধু মাদ্রাজ নয়, ভারতের সব রাজ্য সরকার সহায়তা করলেন। রমীর প্রাসাদ হতে দারিদ্রের পর্ণকুটির পর্যন্ত সাগ্রহে সানন্দে রানাডের চাঁদার তহবিল পূর্ণ করে তুললেন। সেই মহাযজ্ঞে কারো দানই উপেক্ষিত হয়নি।

কাজ চলাকালে চপলাকান্ত একবার গিয়েছিলেন কন্যাকুমারীতে, দেখে এসেছিলেন কি বিপুল আয়োজন করেছিলেন রানাডে। মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবার পরেও একবার তিনি গিয়েছিলেন। এখন এই বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির এক অবশ্যদর্শনীয় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে গেলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সেখানে যান। তীর হতে সমুদ্র বক্ষে নিরাপদে যাতায়াতের নিয়মিত জলযানের ব্যবস্থাও হয়েছে।

কিভাবে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হল তা জানতেন মাত্র চারজন—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীযুত একনাথ রানাডে, শ্রীযুক্ত ভক্ত বৎসলম ও শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। এ বিষয় নিয়ে চপলাবাবু ইন্দিরা গান্ধীর স্মৃতিসভা ব্যতীত আর কোথাও কখনই বলেননি। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে তার বক্তব্য একটি প্রবন্ধ আকারে লিখেছিলেন যা আমার সম্পাদিত 'রবিবাসর' বার্ষিকীর সপ্তদশ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছিল (১৩৯২)।

প্রসঙ্গত স্বামীজি সম্পর্কে চপলাকান্তের আর একটি উক্তি মনে পড়ছে। সাংবাদিক হিসাবে নিমন্ত্রিত হয়ে চপলাকান্ত কয়েকবার বিদেশে গিয়েছিলেন। বিদেশেও তিনি সর্বদাই আহারে ও পরিচ্ছদে তাঁর স্বকীয় স্বভাব অনুসরণ করে চলতেন। একবার আমেরিকার এক নিউজ ব্যারণের বাড়ির পার্টিতে তিনি মৎ কিঞ্চিত নিরামিষ আহার্য মাত্র গ্রহণ করায় গৃহস্বামী বলেন, বৈশবে তিনি তাঁর পিসিমার বাড়িতে স্বামীজিকে কয়েকদিন আতিথ্য গ্রহণকালে দেখেছিলেন, খাদ্য পানীয়ে স্বামীজি কিছুমাত্র বাছবিচার করতেন না। চপলাকান্ত স্বামীজির দেশের মানুষ হয়ে এমন কঠোর নিয়মনিষ্ঠা পালন করেন—কেন ?

উত্তরে চপলাকান্ত বলেছিলেন—স্বামীজি ছিলেন সিদ্ধ সাধক, জ্বলন্ত সূর্যের মত শক্তিধর। খাদ্যাখাদ্যের প্রতিক্রিয়ার ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর অবস্থান। তাঁর সঙ্গে একজন সামান্য সাংবাদিক চপলাকান্তের তুলনা করা চলে না। চপলাকান্ত যদি কোন দিন স্বামীজির মতো শক্তিধর হন, তিনিও খাদ্যাখাদ্যের বিচার করবেন না।

□

With best compliments from :

M/s DELHI IRON & STEEL CO.

48-D Mukta Ram Babu Street

Calcutta-700 007

PHONE : 39-6286—8690

□ নিবন্ধ □

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বাঙালী ঃ নীরদ সি. চৌধুরী

ডঃ অশোক কুণ্ডু

দীর্ঘ দশ বছর পরে এবারে লণ্ডন যাবার সুযোগ আসতেই আমি ঠিক করেছিলাম, ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কাজ ছাড়াও, একটি ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণ করব। সেটি হল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বাঙালী ব্যক্তিঃ নীরদ সি. চৌধুরীর সংগে দেখা করব। সেজন্য এখান থেকেই সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে তাঁকে একটি পত্র দিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওঁর পুরাতন ঠিকানায় চিঠি পাঠানোর জন্য সে চিঠি উনি পাননি।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের আয়োজনে ১৮ই জুন, বৃহস্পতিবার, অক্সফোর্ডে পৌঁছে দুপুরের মধ্যেই যখন আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেল, তখন অক্সফোর্ড শাখার প্রধান মিঃ ডেভিডকে অনুরোধ জানালাম, ফোনে নীরদ সি. চৌধুরীর সংগে যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্য।

ফোনের অপর প্রান্তের কণ্ঠ ভেসে আসতেই, আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে জানালাম—আমি হাওড়া-হুগলী জেলার বড়গাছিয়ার কাছে মহৎস্থলে থাকি।

উনি বললেন—'বড়গেছে'? আপনারা সব আজকাল সাহেব হয়ে গেলেন নাকি? 'বড়গাছিয়া', 'পানিহাটি' বলছেন, বলুন—'বড়গেছে', 'পেনেটি'। যাইহোক, চলে আসুন, কথা হবে।

মিঃ ডেভিড ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর ২০ নং লাইব্রেরি রোডের বাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হলাম। সুন্দর সাজানো বাগানটি পার হয়ে দরজায় বেল বাজাতেই তিনি স্বয়ং দরজা খুলে দিলেন, ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিহিত, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই প্রাণবন্ত মানুষটি—নীরদবাবু। ইচ্ছা করেই এই 'বাবু' শব্দটি লিখলাম, কারণ আমার মনে হয়েছে—উনিই যথার্থ বাঙালী। নীরদ সি. চৌধুরী হল ওঁর ছদ্মনাম—যা ইংরাজী রচনায় ব্যবহৃত।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। বললাম—আমি ছেলেবেলায় যে স্কুলে পড়েছি, সেই জাঙ্গিপাড়া ভারকানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে, আপনার সতীর্থ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন।

হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে আই. এ. পড়েছিলাম। ও-ই আমাকে জাঙ্গিপাড়ায় নিয়ে গিয়েছিল বেড়াতে।

এরপর এই ১৩ বছর বয়সী তরুণের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে স্বচ্ছন্দ বাকনা শুরু হল—যার সামনে আমি মুগ্ধ শ্রোতামাত্র। সেই বিস্তারিত আলোচনার অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অংশই হয়তো ঠিকমত প্রকাশ করতে পারব না। তাছাড়া স্মৃতিও অনেকক্ষেত্রে বিভ্রান্ত করে। তাই নিজ দায়িত্বেই তাঁর বক্তব্যের কিছু সারমর্ম দিলাম।

লোকে বলে, আমি কেন এখানে এসেছি। আমি এখানে নিজের ইচ্ছায় আসিনি, ইংরেজরা আমায় এনেছে। এ সম্বন্ধে আমি আগামী একটি শারদীয়া সংখ্যায় লিখেছি।

ছেলেবেলায় কিশোরগঞ্জে কেটেছে। দশ-বারো বছর বয়সে শেকস্‌পীয়ার পড়েছি, আবৃত্তি করেছি, এখনও মুখস্ত আছে। 'মেঘনাদবধ কাব্য'ও তখনি পড়েছি, এখনও মুখস্ত। বলেই দশ-বারো লাইন মুখস্ত বলে গেলেন।

আমি ১৯২৭ সাল থেকে বাংলায় লিখছি। লোকে আমাকে ইংরাজী-র লেখক বলে মনে করে, কিন্তু আসলে আমি বাংলায় লিখতেই ভালোবাসি। তবে সুযোগ তো চাই। তাই সে সুযোগ যখন এল তখন বেশি করে লিখতে আরম্ভ করলাম। সম্প্রতি আমার যে-ক'খানি বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তা যে এত পাঠক পড়বে, ভাবতে পারিনি। 'আত্মঘাতী বাঙালী' ও 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ'-এর পরের অংশও ছাপা হচ্ছে।

আচ্ছা, আপনি রবীন্দ্রনাথকে 'আত্মঘাতী' বললেন কেন? আমার প্রশ্ন।

আসলে, আমরা সবাই আত্মঘাতী। যা আমরা হতে পারতাম, তা হেলায় হারিয়েছি। আমাদের মহাপুরুষরা তো বটেই। তাঁদের মধ্যে যতখানি সম্ভাবনা ছিল, সেটিকে তাঁরা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারেননি। তবে আমার প্রবন্ধটির নাম ছিল 'আত্মসমাহিত ও আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ'। ছাপার সময় সম্পাদক মশাই প্রথম অংশটি বাদ দিয়ে দিয়েছেন। আমার মতে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার পূর্বে ছিলেন আত্মসমাহিত, তার পরেই হলেন আত্মঘাতী। লোকের নিন্দা-প্রশংসার জবাব দিতে গিয়েই বিপদে পড়লেন। আমি মনে করি সাহিত্যিকদের নিজের থেকে নিন্দা বা প্রশংসার জবাব দেবার দরকার নেই। একদিন না একদিন সত্য প্রকাশিত হবেই। আমার সম্বন্ধে প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই বেশি হয়, কিন্তু আমি কোনদিন জবাব দিইনি। আমাকে অনেকে বলেন, আপনার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছিলাম। আমি বলি, গল্প যদি পক্ষে শুনে থাকেন তা সত্য নয়, বরং বিপক্ষে শুনলে কিছু সত্যতা আছে মনে করবেন।

আমি দিল্লীতে অনেকদিন ছিলাম, কিন্তু অল্প কয়েকটি ছাড়া বিশেষ বাঙালী পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। এখানেও তো বাঙালী কম নেই। তবু এতদিনে মাত্র ৩'টি পরিবারের সঙ্গেই যোগাযোগ ঘটেছে। বরং আমার সঙ্গে এদেশী মানুষের যোগাযোগই বেশি।

আমি মনে করি, ইংরেজীর চেয়ে বাংলা ভাষায় লেখা বেশি শক্ত। বাংলার যতো রকম 'ইডিয়ম' ব্যবহৃত হয়, তা বিদেশীদের পক্ষে রপ্ত করা কঠিন। সে তুলনায় আমরা অতি সহজে ইংরেজী শিখতে পারি। যে-সব বিদেশী বাংলাভাষা জানেন বলে পরিচিত, তাঁরা প্রকৃত বাংলা জানেন না। বলুন তো, বাংলাভাষার অতীতকালের ব্যবহার ক'রকম? এসব কোন বইয়ে পাবেন না, নিজেকে খেয়াল করে জেনে নিতে হবে। আমি অন্ততঃ বাংলায় পাঁচ রকম অতীতকালের ব্যবহার পেয়েছি।

বাংলা থেকে ইংরাজী অনুবাদে অনেক সময় সঠিক শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতাটির অনুবাদ করা হয়েছে 'Bride' নামে। কিন্তু ব্রাইড হল কনেবধূ নয়, আবার 'wife'-ও হবে না। 'বধূ' শব্দটি কিভাবে এসেছে, তা একজন করাসী গবেষক অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু আমরা বাঙালীরা সে কৌতূহল বোধ করিনি। আসলে বাঙালীদের জানার আগ্রহ কমে গেছে।

বাংলা শিখতে গেলে, সংস্কৃত ভালো করে জানতে হবে।

আমি প্রশ্ন করলাম—আপনি ইংরাজী ও বাংলার মধ্যে কোনটি তাড়াতাড়ি লিখতে পারেন?

আমি অনর্গল লিখে যেতে পারি দু'টোতেই। আজ সকালেই দু'ঘণ্টায় তেরো পাতার একটি বাংলা লেখা শেষ করেছি। তবে লেখার সময় তাড়াতাড়ি লিখলেও, পুনরায় পড়ার সময় অনেক ভাবনা-চিন্তা করতে হয়।

সাহিত্য থেকে উনি চলে গেলেন ইতিহাস ও রাজনীতির বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে। একজন মানুষের পক্ষে এত বিচিত্র জীবনজিজ্ঞাসা ও গভীর অধ্যয়ন আমাকে বিস্মিত করেছে। সেইসঙ্গে তিনি প্রকাশ করলেন, বুকের ভিতর পুষে রাখা সেই দীর্ঘকালের গভীর ক্ষতচিহ্নটি—আমি ভারত ভাগ এখনো মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু আমরা দেখুন, নির্বিবাদে পশ্চিমবঙ্গ বলি, অথচ পাঞ্জাবীরা কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাব বলে না। আমরা এইভাবে আমাদের ভাগটা স্বীকার করে নিয়েছি।

তিনি ইংরেজের সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। বললেন, ইংরেজ জাতিও তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। বর্তমানে ইংরেজরা ইংরেজীও জানে না। এ সম্বন্ধে আমি এদেরই কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখেছি।

সময় যে কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল বুঝতে পারিনি। যথা সময়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার ফিরে এসে জানালেন, দুয়ারে রথ প্রস্তুত।

নীরদবাবু ঠিকমত আতিথেয়তা হল না বলে মন্তব্য করলেন, কিন্তু আমার কাছে এর চেয়ে বড়ো কোন লৌকিক আতিথেয়তার প্রয়োজন ছিল না। আমি জানালাম যে, আমরা 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী'-র মাধ্যমে গত কুড়ি বছর ধরে সাহিত্যিকদের তথ্য প্রকাশ করে আসছি। আমাদের সংগ্রহশালাতেও ওঁর সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আছে। ছবি তোলার অনুমতি চাইলে বললেন, ছবি তুলতে দিই না। তবে খাতায় স্বাক্ষর করে দিলেন।

বললেন, চোখে কম দেখি, তবে এখনও কাজ করে যাচ্ছি।

আমি বললাম, আমাদের তরফ থেকে আপনার একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকার নেবার ব্যবস্থা করা উচিত। উনি বললেন, আমাকে নিয়ে এখানে টেলিভিশন অনুষ্ঠান হয়েছে, হয়তো কখনো আপনাদের তখনেও হবে।

বিদায় দেবার জন্য উনি দরজার বাইরে বেরিয়ে এলে, আমি আমার শেষ মন্তব্যটি ছুঁড়ে দিলাম—আমার মনে হয়, আপনি বাঙালীকে ভালোবাসেন বলেই, তাঁদের বিচ্যুতির এত সমালোচনা করেন।

না, না, বাঙালী শেষ হয়ে গেছে।

তা কি করে হবে। আপনার মত বাঙালীও তো এখনো আছেন।

আমাদের মত উন্মাদদের কথা বাদ দিন।

কিন্তু এইসব উন্মাদরা আছেন বলেই তো এখনো পৃথিবীটা চলছে।

তাহলে বলছেন, উন্মাদের সংখ্যা যতো বাড়ে, ততোই ভালো।

নিশ্চয়ই। আপনাদের মত লোক যত আসবেন, ততই জাতির কৃতিত্ব ও গৌরব প্রকাশিত হবে। আপনি উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে একবিংশ শতাব্দীর আগামী প্রজন্মকে একটি বাণীই দিয়ে যাচ্ছেন—বাঙালী এখনও অনেক প্রাণবন্ত, তার শত অভাব-অভিযোগ সত্ত্বেও সে বিশ্বের মানুষের কাছে অনেক কিছুই দিতে চায়।

□

সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের সম্পদই ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদের বৃহত্তর অংশ। গুটিকয় মহানগরীর জৌলুস তার ভগ্নাংশ মাত্র। গ্রামের মানুষের কর্মনিযুক্তির মাধ্যমে আমরা সেই সম্পদ সৃষ্টির কাজে নিরলস প্রয়াসী।

তাই, গ্রামের উৎপাদন বেশী করে কিনে দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন।

চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম খাদি প্রতিষ্ঠান

(খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক প্রমাণিত)

বহরমপুর, (পোঃ খাগড়া, জেঃ মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)

ফোন : BHB-১০৮ গ্রাম : 'CHANDAKANT'

(শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাজার)

কলকাতায় আমাদের বিক্রয় ভাণ্ডার :

খাদি সিল্ক এম্পোরিয়াম

১নং সেক্সপীয়ার সরণি, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

ফোন : ২২-১৯১৮

মহাভারতে দুর্গার কথা

সুধীর কুমার মিত্র

বাল্মীকিরচিত মূল সংস্কৃত রামায়ণে দুর্গা পূজার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু বেদব্যাস-রচিত মহাভারতে দুর্গা পূজার দু-বার উল্লেখ আছে দেখা যায়। মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধারের জন্য একবার যুধিষ্ঠিরকে আর একবার অর্জুনকে দেবীর শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। কবি কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতকে রচিত তাঁর রামায়ণে রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে বোধন করে দুর্গাপূজা করেন বলে যা লিখেছেন সেটি তিনি সম্ভবত দেবী-ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ থেকে গ্রহণ করে রামায়ণে সন্নিবদ্ধ করেছেন। তবে কালিকা-পুরাণে রামচন্দ্রের কথা নেই, সেখানে আছে ব্রহ্মার কথা। এখানে উক্ত গ্রন্থের ৬০ অধ্যায়ের কিছু অংশ অনুবাদ করে দেওয়া হলো।

লঙ্কার যুদ্ধের সময় ব্রহ্মা দেবী দুর্গার অকালবোধন করেন (রামচন্দ্র নয়)। অকালে বোধন করায় দেবী মহাশময় বাঁধিয়ে দিয়ে রাম কর্তৃক রাবণের বিনাশ সাধন করেন। তখন আনন্দিত হয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে দেবীর পূজা করেন। কিন্তু স্বয়ং রামচন্দ্র যে পূজা করেছিলেন সে কথার কোন উল্লেখ এখানে নেই। দেবী ভাগবতে (৩ স্কন্ধ ৩০ অধ্যায়) যা আছে তাও উল্লেখ্য :—

নারদের উপদেশে রামচন্দ্র আশ্বিন মাসে নবরাত্র ব্রত ও দুর্গা পূজা করেন। অষ্টমীতে দেবী দর্শন দেন, আর রামচন্দ্রকে তিনি আদেশ করেন যে, বসন্তকালে লঙ্কায় তুমি আমার অর্চনা করো। তবেই তুমি রাবণকে বধ করতে পারবে। এ থেকে রামচন্দ্র শরৎ ও বসন্তে দু-বার পূজা করেছিলেন বলে মনে হয় এবং বসন্তকালেই যে লঙ্কায় মহাসময় হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। এ ছাড়া ১০৮টি নীলপদ্ম দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র দেবীর পূজা করেছিলেন একথা আছে 'মহাভাগবতে'। সুতরাং কৃত্তিবাস এই সকল পৌরাণিক বিবরণ অনুসরণ করে তাঁর রামায়ণে নিজের কল্পনার সাহায্যে হয়ত 'প্রসঙ্গটি' সন্নিবদ্ধ করেছেন। পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের 'সময় ক্রিয়া কৌমুদি' গ্রন্থে এই সম্বন্ধে লেখা আছে।

মূল বাল্মিকী রামায়ণে মহর্ষি অগস্ত্য রাবণ বধ করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে সবিতৃদেব সূর্যের উপাসনায় মন নিবিষ্ট করতে উপদেশ দেন। তাঁর শক্তি বর্ণনাকালে মহর্ষি বলেন যে, "ইনি রশ্মি দ্বারা সমস্ত উদ্ভাবন ও দেবাসুরকে পালন করে থাকেন; ইনি সর্বদেবাত্মক, তেজস্বী, ক্রমোদ্য বেদত্রয় প্রতিপাদ্য, বেদ পুঃ এবং জলোৎপাদক।" কৃত্তিবাস কর্তৃক তাঁর রামায়ণে সবিতৃদেব সূর্যের পরিবর্তে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব প্রসঙ্গ অবতারণা করাও আশ্চর্য নয়।

মহাভারতে দুর্গার শরণাপন্ন হওয়ার কথা প্রথমে পাওয়া যায় বিরাট পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে অতিক্রান্ত হলে ত্রয়োদশ বৎসরটি পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস করতে হবে, যাতে তাঁদের কেউ না চিনতে পারে। চিনতে পারলেই তাঁদের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস নিষ্ফল হয়ে যাবে, তাই পাঁচভাই পাঁচটি নাম গ্রহণ করে বিরাট রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। "জয়ো-জয়ন্তো-বিজয় জয়সেনো জয়াবলঃ" প্রভৃতি।

অনন্তর যুধিষ্ঠির ভাবি নিজ মনে।
পাঁচের পাঁচটি নাম রাখিলা গোপনে।
জয় জয়ন্ত বিজয় আর জয়সেন।
জয়বল এই পাঁচ নাম রাখিলেন।

বিরাট রাজ্যে প্রবেশ করেই যুধিষ্ঠির সর্বভয় নিবারণী ভবতারণ কারিণী দুর্গতিনাশিনী জগৎ জননীর শরণাপন্ন হলেন। "ত্রিভুবনেশ্বরী ভগবতী শ্রীদুর্গারে ধর্মপুত্র লাগিলেন স্তব করিবারে।" এই জননী দুর্গতিহারিণী দুর্গা যে নন্দগোপকুলে জাত যশোদাগর্ভসম্ভূতা, তা যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা থেকে বোঝা যায়।

যশোদানন্দিনি নারায়ণ প্রসবিনি।
কুলবিবর্ধিনি কংসবিধ্বংসকারিণী।
জয় হে মা ভগবতী অসুরনাশিনি।
ব্রহ্মচর্যব্রতা বাসুদেবের ভগিনী।

এইভাবে যুধিষ্ঠির দীনতারিণী দুর্গাকে স্তুতি করতে লাগলেন। কৃষ্ণে কুমারী। ব্রহ্মচারিণী। চতুর্ভুজে। তুমিই কৌমার ব্রত ধারণ করে বর্গ রক্ষা করেছিলে। ত্রৈলোক্য বিনাশের জন্য তুমিই মহিষাসুর বধ করেছিলে। তুমিই জয়া, তুমিই বিজয়া ও সংগ্রামে তুমিই বিজয় প্রদান করো। সম্প্রতি বরদা হয়ে মা তুমিই আমার বিজয় প্রদান করো।

মধুমাংসপশুপ্রিয়ে হে কাষ্ঠচারিণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী।
ধনপুত্র লাভ তার হয় সুনিশ্চয়।
দুর্গমে তারিণী বলি দুর্গা নাম কয়।
সুরেশ্বরী তুমি কীর্তি লক্ষ্মী সিদ্ধি ধৃতি।
লজ্জা বিদ্যা সন্ধ্যা রাত্রি বৃদ্ধি বা সন্ততি।
প্রভা নিদ্রা জ্যোৎস্না তুমি ক্রান্তি ক্ষমা ধরা।
অভীষ্টদায়িনী মাগো তুমি মহামায়া॥

যুধিষ্ঠির আরো বললেন—তুমি সকলকে সব রকম বিপদ থেকে উদ্ধার করো, মা আমি রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে আজ তোমার শরণাপন্ন, তুমি আমায় আশ্রয় দাও। "রাজ্যনাশ বনবাসে কষ্ট পেয়ে কত—শ্রীচরণে স্মরণ লয়েছি আমি মাতঃ।" যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় দেবী আবির্ভূতা হয়ে বললেন—হে রাজন। ভাইদের সঙ্গে তুমি প্রভূত সুখ পাবে। আর আমার প্রসাদে বিরাট নগরে তোমরা যখন থাকবে, তখন তোমাদের কেউ চিনতে পারবে না। তাঁর নাম নিষ্পাপ ব্যক্তি স্মরণ করলে কি হয়, সে বিষয়ে তিনি বলে তারপর অন্তর্হিতা হলেন।

নিষ্পাপী মনেতে নাম করিলে কীর্তন।
রাজ্য আয়ু ধন পুত্র দিই হে রাজন।
প্রবাসে নগরে ঘোর সঙ্কটে সংগ্রামে।
গহনে কাননে শৈলে সাগরে দুর্গমে।
বিপন্ন হইয়া যেবা স্মরয়ে আমারে।
দুর্গতি না থাকে কিছু কহিনু তোমারে।

মহাভারতে দ্বিতীয়বার দুর্গার উল্লেখ আছে ভীষ্মপর্বে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের বিপুল সৈন্য সমাবেশ দেখে অর্জুনের হিতের জন্য তাঁকে শত্রুর পরাজয়ের আশায় (পরাজয়ায় শত্রূনাং) দুর্গাস্তব করতে বললেন, অর্থাৎ ভগবতীর মনোগামী গান করতে বললেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশানুসারে দুর্গাস্তব মুখে জগজ্জননীর তুষ্টিসাধন ছাড়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের বিজয়ের কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। "শত্রুদের পরাজয় হেতু এই ক্ষণ—যুদ্ধ মুখ হয়ে কর দুর্গার স্তবন।" অর্জুন তখন ভয়বিহ্বল চিত্তে রথ থেকে নেমে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁকে আশ্রয় দেবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানালেন। স্তুতিমুখে অর্জুন দেবীকে বললেন :

হে সিদ্ধসেনানি আর্যে সাগরবাসিনি।
কুমারি কপালি কালি কল্যাণদায়িনি।
করালি বিজয়ে জয়ে উমে কাত্যায়নি।
মহিষকৃধিরপ্রিয়ে চণ্ডি নারায়নি।
স্তব তব করি আমি অন্তরাত্মা মনে।
প্রণিপাত করি মাতা তোমার চরণে।
মানববৎসলা দুর্গা অর্জুনের স্তবে।
তুষ্ট হয়ে দেবা দিল দূর নৃত্য নভে।
কৃষ্ণের সমীপে দুর্গা কহিলা অর্জুনে।
অল্পকালে শত্রুদলে জিনিবে রণে।

হে জননী তুমি যোগসিদ্ধকারী, তুমি সর্বকল্পসমন্বয় ভূতা, তুমিই কালী, তুমিই কপিলা, তুমিই কৃষ্ণপিঙ্গলা, তুমি ভদ্রকালী, চণ্ডী, চণ্ডা, তারিণীবরবর্ণিনী, তুমিই কাত্যায়নী, করালী, জয়া, বিজয়া, সিদ্ধিপুদ্ধরাজ ধরা, মহাপুলপ্রবহনা, ঘণ্টাষেটকধারিণী, মহিষরক্তপ্রিয়ে, কৌশিকী, পীতবাসিনী, অট্টহাসে, কোকমুখী, তুমিই উমা, শাকম্ভরী, শ্বেতা, কৃষ্ণা, কৈটভনাশিনি, পীতনয়নী। তুমিই হিরণ্যাক্ষী, ত্রিকপাক্ষী, সুবস্ত্রাস্ত্র, তুমিই বেদশ্রুতি-মহাপুণ্যা, ব্রহ্মণ্যা বা বেদহিতা এবং জাতবেদসী অর্থাৎ ব্রহ্মাদির সুপরিজ্ঞাতা বা অতীতজ্ঞা।

জ্ঞানিরা তোমাকে আহা, সুধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, বেদমাতা, গায়ত্রী এবং উপনিষদ বলে থাকেন। মহাদেবী! আমি পবিত্র চিত্তে তোমার স্তব করলাম, তুমিই রতি, মোহিনী, মায়া, লজ্জা, দীপ্তি, প্রকৃতি ও জগতের জননীস্বরূপ। দেবী তখন সন্তুষ্ট হয়ে পাণ্ডবকে "তুমি শত্রুদলকে জয় করবে" বলে অন্তর্হিতা হবার আগে বলেছিলেন :

নর তুমি নারায়ণ তোমার সহায়।
তোমারে জিনিতে পারে কে হেন কোথায়।
কিবা সে অস্ত্রের কথা নিজে বজ্রধর।
ইন্দ্রও তোমার রণে হইবে কাতর।
এতেক কহিয়া দুর্গা হৈলা অন্তর্হিত।
বর লভি পার্থ হৈলা রথে আরোহিত।

□

With best compliments from :

VARUN UDYOG

P/593 Purna Das Road

Calcutta-700 029

যুক্তি-বিজ্ঞান-ধর্ম-আধ্যাত্মিকতা

ডঃ অরুণ শীল

মানুষ হোল তনু-প্রাণ-মনের সমষ্টি। এদের সমন্বিত ধর্মের ওপর মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তনুর ধর্ম শৃংখলা (Discipline), প্রাণের ধর্ম আবেগ (Devotion), মনের ধর্ম মনন (Determination)। তনুর ধর্মে দাস্যভাব, প্রাণের ধর্মে দৈধিলা, আর মনের ধর্মে নিশ্চয়তা,—অন্যভাবে বললে যা দাঁড়ায়। জীবজগৎ, যাদের আবির্ভাব মানুষের আগে, তারাও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করে। তাদের নিয়ামক হোল মহাপ্রকৃতি, আর সেই নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হোল প্রবৃত্তি (Instinct), যা আদিম মানুষের মধ্যে এখনও পাওয়া যায়।

মানুষের মধ্যে মননধর্ম আবেষ্টিত হবার পর যখন মননশীলতা (Intellect) সহজাত হয়ে উঠলো, তখন মানুষ হোল বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধির হাতিয়ার হোল যুক্তি (Reasoning)। তাই মানুষ সহজেই যুক্তিবাদী (Rational)। যুক্তিবাদের অন্তিম পরিণতি মানুষের বিজ্ঞান সাম্রাজ্য (Science বা Scientific World), যেখানে মানুষ প্রকৃতির রাজা।

মানুষের প্রাণের ধর্ম আবেগ, মানুষকে আর এক সমৃদ্ধ রাজ্যে নিয়ে চললো। যেখানে যুক্তির চল নাই। যেখানে ভক্তি আর উক্তি। সে রাজ্য মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করলো ধর্মের আবরণে। —সূচনা হোল অনেক ধর্মের, বিচিত্র বিশ্বাসের। আসলে এরা সেই আবেগ ধর্মেরই বহুবর্ণের প্রকাশ, স্থান-কাল-পাত্রভেদে। সব ধর্ম-গুরু বা প্রবর্তকই চেয়েছেন, আপন ধর্মবিশ্বাসকে সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান ও মান দিতে, মানুষকে বহুত্ব ও বিচিত্রত্বের স্বাদ থেকে সরিয়ে নিয়ে একমুখী ও একবর্ণীয় আয়তনে ধরে রাখতে। তাই সেখানে এক-গুরু, এক-বই, এক-আচার, এক-বিধি। অমান্য করার দায় হোল দণ্ড। পার্থক্য কেবল হিন্দু সনাতন ধর্মে, যেখানে বহুত্বের ও বিচিত্রত্বের স্বাদ ঘোচানো যায়নি। তাই সেখানে ধর্মীয় শাসনে একেশ্বর, বহুশ্বর, নিরীশ্বর সবাই আসনিত, কোনো বিশেষ একজন গুরু সেখানে একমাত্র গুরু নন, কোনো বিশেষ পুস্তক যেখানে একমাত্র মাতৃগ্রন্থ নয়।

প্রাণের ধর্ম হোল আবেগ; আর আবেগের ধর্ম হয়ে উঠল "ধর্ম" (Religion), যেখানে যুক্তি অচল। অতিমে ঈশ্বরের ইচ্ছায় অহোরহ ঈশ্বরপুত্রকে হত্যা। ধর্ম (Religion) ও আধ্যাত্মিকতা (Spirituality) এক নয়। অনাধিক অর্থাৎ ধর্ম যাকে বেষ্টন করতে পারেনি, যিনি ধর্মীয় আচার-আচরণের ঊর্ধ্বে, ব্যক্তিত্ব আধ্যাত্মিকতার (Spirituality) প্রকাশ হতে পারেন।

তনু-প্রাণ-মনের ঊর্ধ্বে বিরাজিত এক সত্তার অস্তিত্ব সকল কবি-দার্শনিক-মরমীরা স্বীকার করে নিয়েছেন, অনাদিকাল হতেই। বেদের ঋষিরা এ সবের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা। সমস্ত বেদ-উপনিষদ এদেরই ব্যাখ্যান ও প্রকাশ। বেদ-উপনিষদের আধ্যাত্মিকতা এক ধরনের বিজ্ঞান, এক ধরনের যুক্তিবাদ। তবে সে যুক্তির ভিত্তি হোল বোধি (Intuition)। যা মনকে দিয়ে অনুভূতির দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে। মনকে সংজ্ঞায় ভরে দেয়, প্রাণকে আবেগে আপ্লুত করে, তনুকে রূপান্বিত কোরে কোনোদিন বা রূপান্তরিত কোরবে।

আধ্যাত্মিকতার আলোকে ধর্ম হোল অহেতুক কোলাহল, যার বেষ্টনীর বাহিরেই থাকেন বিজ্ঞানী-দার্শনিক-কবি-মরমীরা। অন্ততঃ মানসিকতার দিক থেকে।

আজকের বিজ্ঞানের জোয়ারে মানব-সভ্যতা যখন প্রবমান, তখন নতুন কোরে যুক্তি-বিজ্ঞান-ধর্ম-আধ্যাত্মিকতার প্রকাশকে কালাই কোরে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

ধর্ম আমাদের যা দেয়, তার বহুগুণ অতিরিক্ত আমাদের দিতে পারে যুক্তি-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা।

ধর্মীয় গুরু আমাদের যা দিতে পারে, তার বহুগুণ আমাদের দিয়েছে একজন কবি-মরমী-বিজ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক পুরুষ।

ধর্ম একটা রাজনৈতিক ব্যানারের মত ; আমাদের কুহক-ডাকার মতো যুক্তিহীন প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে আছড়ে মারে। দুটি যাত্রার "কমন ফ্যাকটার" হোল কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা, কিছু নেওয়ার নেশা।

আগামী মানবসভ্যতার প্রাংগণে ধর্ম তার আসন নিশ্চয়ই হারাবে যুক্তি-বিজ্ঞান-আধ্যাত্মিকতার কাছে।

মন্দির-মসজিদ-গীর্জার আয়তনের ফাঁক দিয়ে, যে-ফাঁকির বহর মানুষকে জানিয়ে দেবে, তাই হবে ধর্মের কফিনের শেষ পেরেক।

প্রভাতের আলোয় মানুষ একটৈশ্বরকে খুঁজে পাবে, কবির কাব্যে, খুঁজে পাবে অন্তরের অসীম বংকারকে, বিজ্ঞানীর যুক্তিবাদের সাধনায় বিজ্ঞানের অনন্ত জিজ্ঞাসাকে, আর আধ্যাত্মিকতার আলোয় চৈতন্যের নশ্বর প্রকাশকে।

With Best Compliments from :

Rohini Bagchi

★
★★

72 Dr. Sundari Mohan Avenue

CALCUTTA-700014

ভয়ঙ্কর সুন্দর নায়েগ্রা

ডঃ শিশির কর

সুপিরিয়র, মিচিগান, ইরি, অন্টারিও, হুরন—এই পঞ্চহ্রদের দেশ উত্তর আমেরিকা। এর সঙ্গে মিলেছে অসংখ্য নদী, জলপ্রপাত। কোনো কোনো নদী, হ্রদ মিলেছে সাগরে—আতলান্টিক মহাসাগরে। সেন্ট লরেন্স নদী, অন্টারিও লেক সাগরে মিশেছে। এই অন্টারিও লেক সমৃদ্ধিত হচ্ছে নায়েগ্রার জলরাশিতে।

মিসিসাগার সুপলদার (সুপলফিল্মের ঘোষ) বাড়ি থেকে বিশ্ববিশ্রুত নায়েগ্রা জলপ্রপাত মাত্র ৭০ মাইল। টরেন্টো বিমান বন্দর থেকে সুপলদার বাড়ি প্রায় ২০ মাইল। সেদিন ছিল রবিবার। সুপলদার গাড়িতে আমি, বৌদি, রবি, অলোক বের হলাম নায়েগ্রা জলপ্রপাতের উদ্দেশ্যে। সুন্দর রাস্তা, দুপাশে সবুজ প্রান্তর আর মেপেল গাছের সারি। অসংখ্য নাম না-জানা গাছের মাঝে মাথা উঁচু করে আছে সিচ জলের লম্বা লম্বা কাণ্ডগুলো। পথ এত মসৃণ ও পরিষ্কার এবং পথের দু-পাশের শোভা এত সুন্দর যে এ পথ অসীম হলেও ক্লান্তি নেই। তার উপর পথের সাথী চির পরিচিত চির নতুন বাংলা গান। ক্যাসেটে গান শুনতে শুনতে একটু পরেই আমরা পৌঁছে গেলাম নায়েগ্রা পার্কে। সেখানে গাড়ি পার্কিংয়ে রেখে পায়ে হাঁটা সারলাম। লিলিবৌদি তাড়াতাড়িতে ভালই ব্যবস্থা রেখেছিলেন—পরটা, সব্জি, মিষ্টি, ফল। নায়েগ্রা, যেতে যেতে মাঝে মাঝেই পড়ে এ রকম পার্ক। সুন্দর সাজানো বাগান। সবুজ গাছপালা আর রঙবেরঙের ফুলের মধ্যে পর্যটকদের ভিড়—অধিকাংশেই বিদেশী। তবে জাপানিই বেশি। ইউরোপ-আমেরিকা-কানাডার সর্বত্রই দেখেছি বেশিরভাগ পর্যটকই জাপানি। দু-হাতে ডলার ওড়াচ্ছে। আমেরিকান ট্যুরিস্টদের চেয়ে এরা মুক্ত হস্ত। বুদ্ধের দেশে এরা কেন দলে দলে আসে না?

কানাডার পথের দুপাশে, প্রান্তরের সর্বত্র মেপোলের পর মেপোল গাছের সারি। এই মেপোল এদের খুব প্রিয়—মেপোলের পাতা কানাডার জাতীয় প্রতীক। মেপোলের রস খুব সুস্বাদু—আমাদের দেশে খেজুরের রসের মতো, তবে দেখতে রবার গাছের মতোই। আর রবারের মতোই এর বলিষ্ঠ কাণ্ড থেকে রস সংগৃহীত হয় পাত্রে। বোতলে করে এই রস বিক্রিও হয়। পথের পাশের এক বাগানে দেখলাম একটা বিরাট ঘড়ি—ফ্লোরাল ক্লক। রঙ-বেরঙের সুন্দর সুন্দর ফুল দিয়ে 'অন্টারিও' লেখা।

নায়েগ্রা জলপ্রপাতের ভয়ঙ্কর সুন্দরকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। শ্বাসরুদ্ধ উত্তেজনায়, অবাক বিস্ময়ে অপলক নয়নে শুধু চেয়ে থাকতে হয় সেই ভয়ঙ্কর সুন্দরের দিকে। কোথা থেকে যেন প্রচণ্ড গতিতে জলের পাহাড় ছুটে আসছে—আর তার চেয়ে ভীব্রতর গতিতে শত শত ফুট নীচে ঝাঁপ দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু এর সামনে পড়বে তাই গ্রাস করবে। এ যেন নটরাজের প্রলয় নৃত্য। দুর্বার গতিতে অনবরত বয়ে চলেছে ফেনোচ্ছল বিপুল জলরাশি। বিরাম-বিহীন সেই অকারণ অবারণ প্রবাহ চলেছে তো চলেছেই।

বিশ্বের বিস্ময় এই ভয়ঙ্কর সুন্দর নায়েগ্রাকে ভাল করে একেবারে কাছ থেকে দেখার জন্যে আমরা টিকিট কেটে প্লাস্টিকের পোলাক পরে নকল মহাকাশচারী সেজে টানেলে ঢুকলাম। লিফটে নামছি তো নামছি—এ যেন পাতাল প্রবেশ। মনে হচ্ছিল, কোন গভীর খনির মধ্যে ঢুকছি।

কঠিন পাহাড়ের বক্ষ বিদীর্ণ করে এই টানেল—শত শত ফুট নীচে চলে গেছে। লিফটে আপনি যেন নিমেষে নেমে যাবেন এই সুগভীর গহ্বরে। যা বিদ্যুতের কল্যাণে দিনের আলোর মতোই আলোকউজ্জ্বল। সেখানে ছোট ছোট অলিন্দ। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় শত শত ফুট উঁচু থেকে প্রচণ্ড বেগে নেমে আসা জলের পাহাড়কে। মনে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু এর সামনে পড়বে সবই সে গ্রাস করবে। অনবরত, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হচ্ছে শ্বেতশুভ্র জলরাশি। অবাক হয়ে দেখি সেই বিরামবিহীন জলপ্রপাত যা প্রচণ্ড বেগে দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে, বিস্ময়ভরা মুগ্ধ চোখে তা দেখি আর ভাবি কোথা থেকে আসছে এত জল।

অনেকক্ষণ টানেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, কয়েক শ' ফুট উঁচু থেকে পড়া জলের পাহাড়। জলের ছিটে লেগে আমাদের চুল হাত ভিজে গেল। এবার বুঝলাম, কেন এই প্লাস্টিকের পোশাক। নায়েগ্রার টানেলে ঢোকার টিকিটের সঙ্গেই এই পোশাকের মূল্য ধরা। লাইন দিয়ে লিফটে ওঠার আগেই এই গায়ে চাপিয়ে নেয় সকলে। জলপ্রপাত থেকে ঠিক আমাদের দেশের চলন্তে গুঁড়ির মতো বৃষ্টি পড়ছে। সামনে অদূরে প্রচণ্ড বেগে বেরের বাবমান অশ্বের মতোই জলের পাহাড় ছুটে চলেছে। আর তা থেকে আসছে জলের বিস্ফোরণ। নীচে সুগভীর টানেলে নেমে যেমনি, তেমনি ছোট ছেলে ছেলে অনুচ্চ লাইনে উঠেও দেখা যায় এই নায়েগ্রাকে। এর জন্য আলাদা করে টিকিট কাটতে হল। যুগলদাই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটলেন। এবার আমরা সকলেই উপরে উঠলাম উঁচু থেকে নায়েগ্রাকে দেখতে। আমি, রবি, অলোক, যুগলদা ও লিলিবৌদি ফুড়ে মাথা খোলা কামরায় বসে চালু চেয়ার দিয়ে কয়েক শ' ফুট উপরে উঠে দেখলাম দূরে থেকে নায়েগ্রাকে। তবে টানেলে নামার সময় যুগলদা ও লিলিবৌদি উপরে সপিং সেন্টারে ঘুরছিলেন। অনুচ্চ পাহাড়ের উপরে উঠে আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আরও ব্যাপক এলাকায় নায়েগ্রাকে দেখা যায়—কানাডা-আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই ভয়ঙ্কর সুন্দর নায়েগ্রার বিপুল জলরাশির দুর্বার গতি, উদ্দাম নৃত্য দেখা এক অনাস্বাদিত, অনির্বচনীয় অনুভূতি। দুই দেশ জুড়ে এই বিশাল জলপ্রপাত—এদিকে কানাডার ঘিসিসাগা ওদিকে আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশ।

এই ভয়ঙ্কর সুন্দর নায়েগ্রাকে ট্যুরিস্টরা নানাভাবে দেখে। কেউ কেউ ট্রেনে চেপে পাহাড়ে উঠে দূর থেকে, কেউ বা গভীর টানেল দিয়ে পাতালে নেবে। আবার কেউ কেউ জাহাজে করে উপভোগ করে নায়েগ্রার সৌন্দর্য। টিকিট কেটে ছোট ছোট জাহাজে উঠে ব্লু পোষাক পরে তারা দেখে নায়েগ্রাকে খুব কাছ থেকে যেখানে এই বিপুল জলরাশি পাহাড় থেকে পড়ে সমতলে নৃত্যের ছন্দে ছুটে চলেছে। সেই জলরাশির বুকে জাহাজে চেপে ব্লু জামার বর্ষাতি গায়ে বহু ট্যুরিস্ট দূরবীণ হাতে দেখছে নায়েগ্রাকে। জলের বেগের সঙ্গে কি করে তাল দিচ্ছে জাহাজ? জলের ছিটে পড়ে জাহাজের ধারে ঘন কুয়াশার মতো আবরণ পড়েছে। দূর থেকে পরতের পাতলা মেঘের মতো দেখাচ্ছে। তার বুকে পাখিও উড়ছে। আকাশ যেন অনেক নীচে নেমেছে। পাখির রঙ-ও ব্লু। কী পাখি? এরা কি সিগাল বা সেন্ডুইন? জাহাজের ব্লু পোশাকের আরোহীদেরও পাখির মতোই দেখায় দূর থেকে।

কানাডার ঘিসিসাগা থেকে আমরা যেমন নায়েগ্রার কূলে এসেছি। তেমনি অনেকে এসেছে আমেরিকা থেকে। আমরা যেমন নায়েগ্রার পশ্চিমকূলে, ওরা তেমনি পূর্বকূলে। এখানে যেমন গঙ্গার পশ্চিমে হাওড়া ও পূর্বে কলকাতা। ওখানে তেমনি একদিকে কানাডা, অন্যদিকে আমেরিকা। পৃথিবীতে দু দেশ জুড়ে আর কোন জলপ্রপাত আছে বলে জানি না।

বিশাল নায়েগ্রার জলরাশির বুকে আলোর খেলা শুরু হয় অন্ধকার নামলে। অদূরে বৃক্ষশাখার, উঁচু জমিতে, গৃহের ছাদে, ব্রিজের রেলিঙে, উঁচু ল্যাম্প পোস্টে উচ্চ শক্তির রংবেরঙের অসংখ্য বিজলী আলো ফিট করা আছে—বোতাম টিপলেই তা জ্বলে উঠে। আর জলের পাহাড়ে শুরু হয় রঙের খেলা। পর পর নানা রঙে অবগাহন করে প্রচণ্ড বেগে ধাবমান জলের পাহাড়টি। ভয়ঙ্কর সুন্দর নায়েগ্রা আরও সুন্দর, আরও চমৎকার, আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আপনাকে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করবেই। মনে হবে স্বর্গের অপ্সরারা নেমে এসে আপনাকে হাতছানি দিচ্ছে, তা ছেড়ে কি কেউ আসতে পারে? এ ছাড়া নায়েগ্রার তীরেতে এক বিশাল ফোয়ারার আলোর নৃত্য দেখা যাবে রাতে। রাত ৯টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে এই জল ও আলোর রোমাঞ্চ। ট্যুরিস্টরা ভিড় করে তা দেখে। বহু ট্যুরিস্ট এই ভয়ঙ্কর সুন্দর নায়েগ্রাকে দেখতে এর আশপাশে হোটেলে ঘর বা কট ভাড়া করে থাকে। কেউ আমেরিকা ও কানাডা—দুদিক থেকেই উপভোগ করে নায়েগ্রার সৌন্দর্য। এজন্য দুদেশের পৃথক পৃথক ভিসা চাই। তবে কানাডার দিক থেকে নায়েগ্রাকে যত সুন্দর দেখায়, আমেরিকার দিক থেকে তত নয়।

নায়েগ্রার চারধারে অসংখ্য ছোট-বড় পার্ক আছে। আছে জলবিদ্যুৎ তৈরির কেন্দ্র। সেগুলোও আলোয় ঝলমল করে উঠে রাতের অন্ধকার নামলেই। কখনও এর ব্যতিক্রম হয় না। ওখানে তো লোডশেডিংয়ের বালাই নেই। নায়েগ্রার মতো একটা জলপ্রপাত থাকলে আমরাও রেহাই পেতাম লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণা থেকে।

আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত-এর চেয়ে বড়। কিন্তু তা কানাডার মতো দুদেশ জুড়ে ছড়িয়ে নেই। নায়েগ্রার দুপাশে শুধু অসংখ্য ছোট-বড় পার্কই নেই, আছে অসংখ্য সুদৃশ্য বিল্ডিং, যা নানারকম ম্যানুফেকচারিং করা। আর নানা রেস্তোরাঁ, হোটেল, কফি কর্নার। আছে একাধিক হাইড্রো পাওয়ার স্টেশন। এই জলপ্রপাত থেকে দুদেশের প্রচুর বিদ্যুৎ তৈরি করে। তাই তো এখানে এই আলোর বন্যা।

টিপ টিপ বৃষ্টি নামল। আমরা নায়েগ্রার পাশে একটা দোকানে ঢুকলাম কফি খেতে। ভিক্টোরিয়া পার্ক রেস্তোরাঁ। একপাশে চা-কফি-স্ন্যাক আর একধারে গিফট বিক্রির কাউন্টার। আমরা কফি-কেক খেয়ে ২।১ ম্যাগনেট কিনে বের হলাম। তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। মুগলদা বল্লেন, 'সবার ভেজার দরকার নেই। আমি পার্কিং থেকে গাড়িটা আনছি।' পার্কিং প্রায় আধ মাইল দূরে। এত ভীড় যে কাছাকাছির পার্কিংয়ে ঠাঁই মেলেনি। আমাদের ট্যানেলে নামার প্লাস্টিকটা বেশ কাজে লাগল এই বৃষ্টিতে। ইচ্ছে ছিল আরও রাত পর্যন্ত থেকে নায়েগ্রার ভয়ঙ্কর রাতকে উপভোগ করা। রাতে বিদ্যুৎ-আলোর ঝলকানিতে নায়েগ্রার সেই অতুলনীয় শোভা ভোলা যায় না। নায়েগ্রার দুর্বার জলস্রোতে আলোর রঙের বিকিরণ, পার্কে পার্কে ফোয়ারার আলোর খেলা, বাদ্যের তালে তালে রঙবেরঙের আলোর বিকিরণের সঙ্গে জলের নৃত্য আপনাকে মুগ্ধ বিস্ময়ে আটকে রাখবে।

নায়েগ্রার বিপুল জলরাশি নয়তলে নেমে মিশেছে অন্তারিও লেকে। মিসিসাগা ট্রয়েন্টোর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে এই লেক—বিশাল কানাডার অনেকটা অঞ্চল জুড়েই এই সুদীর্ঘ লেক। এই লেক আবার মিশেছে মহাসমুদ্রের সঙ্গে। এর তীরে বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত বন্দর ট্রয়েন্টো যার অদূরেই আটলান্টিক মহাসাগর। পদ্মা যেমন কলকাতা আর বঙ্গোপসাগরের যোগসূত্র, এখানে অন্তারিও লেকও তাই। মিউইয়র্কের সঙ্গে আটলান্টিকের জল-সেতু হাডসন নদী, লণ্ডন থেকে আটলান্টিকে জাহাজ পাড়ি দেয় টেমস নদী-পথ বেয়ে।

□

With best compliments from :

Telex : 21-7474
Show in Hindequip
Calcutta

PHONE : 20-1316
20-1319
20-1330

JAYER & COMPANY

MANUFACTURERS & EXPORTERS

2 India Exchange Place
Calcutta-700 001

Manufacturers of

Zinc Stearate	Zinc Chloride
Calcium Stearate	Zinc Sulphate
Aluminium Stearate	Copper Sulphate
Alpha Cellulose Powder	Copper Carbonate
Phenyle	Nickel Sulphate

Absorbent Cotton Wool

কলকাতার আদিকালী ঃ করুণাময়ী মা

বিমল কুমার ভট্টাচার্য্য

সেদিন ছিল রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ছুটির দিনে আমরা সাধারণত কোথাও না কোথাও বেড়াতে গিয়ে থাকি। তাই সেদিন আমরা মনে মনে ভাবলাম যে, এই কলকাতা শহর তো একটি বিশেষ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান, সুতরাং এর আশেপাশে কোন জায়গায় ঘুরলে হয় তো এখনও কোন অতীত ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত বিখ্যাত স্থানের সন্ধান পাওয়া যাবে। এই ভেবে তাই আমরা সেদিন দুই বন্ধুতে মিলে বেড়িয়ে পড়লাম কলকাতার পশ্চিমদিকে তথা পুরোন টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর অভিমুখে।

সেবার আমাদের পায়ে হেঁটে যাওয়াই স্থির হয়েছিল। তাই সেদিন আমরা টালিগঞ্জের রাসবাড়ীর সংলগ্ন পঞ্চাননতলার ঘাট থেকে মহাশ্মীরতলা হয়ে আদি গঙ্গার তীর ধরে বরাবর সোজা পশ্চিমদিকের পথ বেয়ে সানন্দে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। সেদিন আদি গঙ্গার তীর ধরে পথ চলতে চলতে আমরা দু'জনে অতীত স্মৃতির রোমন্থন করছিলাম। বর্তমানে এই আদি-গঙ্গা জীর্ণকায়া একটি অপ্রশস্ত খালাখালে পরিণত হলেও একদিন এই আদিগঙ্গা ছিল কিন্তু বিপুল প্রশস্ত ও ভীমস্রোতা। ইতিহাস আজও তার এক উজ্জ্বল সাক্ষী হয়ে আছে। একদিন এই আদিগঙ্গার উপর দিয়েই বিজয় সিংহ ও শ্রীমন্ত সওদাগর তাঁদের সুসজ্জিত বিশাল সপ্তডিঙ্গা মধুকরপল্লী নিয়ে সুদূর দক্ষিণে সিংহল দ্বীপে বাণিজ্য যাত্রা করেছিলেন। আবার এই আদিগঙ্গার উপর দিয়েই একদিন নামকীর্তন করতে করতে ভক্তগণ সহ নৌকাযোগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলের পথে গমন করেন। পরে আরও জানা যায়, সাগর যাত্রীরাও একসময় নৌকা করে দলবদ্ধভাবে এই গঙ্গাপথ দিয়েই সাগর তীর্থ অভিমুখে যেতেন। জলপথে সুন্দরবনে যাবার সেদিন এইটেই ছিল একমাত্র পথ। আর এই পথেই যাতায়াত করত একসময় রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরাট নৌবহর। নিরীহ যাত্রীদের উপর আরাকান জলদস্যুদের বর্বরোচিত অত্যাচারও সে-সময় কম হয়নি এই পথে। কিন্তু পরে অবশ্য রাজা প্রতাপাদিত্যের আদেশে তাঁর রণ-পারদর্শী নৌ-বাহিনীর সৈন্যরা জলদস্যুদের সেই ভয়াবহ অত্যাচার সব বন্ধ করে দিয়েছিল। এই রকম বহু পুরোন দিনের নানা কাহিনী নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা দুই বন্ধুতে পথ চলছিলাম। সেদিন আমাদের বড় ভাল লাগছিল এইসব অতীত স্মৃতিচারণে। দেশের এইসব মধুর সুপ্রাচীন গৌরব গাঁথার আলোচনায় মন আমাদের সে-সময় এতই নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, আমরা অবিরাম পথ হেঁটেও একটি মুহূর্তের জন্য কখন পথ চলার কষ্ট দেহে অনুভব করিনি। এইভাবে পথ চলতে চলতে একসময় একটি জায়গায় এসে হঠাৎ আমরা দু'জনেই খানিকটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে আমাদের তখন বেশ একটু আনন্দও হল, ভাবলাম আমাদের অভীষ্ট যোগহয় পূরণ হতে চলেছে। সত্যিই হল তাই, জায়গাটির নাম হল "করুণাময়ী"। ইটলখাটার অন্তর্গত মিত্তিরীর

মোড় ছেড়ে সামান্য একটু পথ এগিয়ে গেলেই পড়বে এই স্থানটি। এখানে পৌঁছে আমরা দেখলাম, এই করুণাময়ী অঞ্চলের পাশ দিয়ে এখনও অতি মোচনীয়ভাবে কোন ক্রমে বয়ে চলেছে কীণস্রোতা আদিগঙ্গার শেষ ধারা। পুরান দিনের সাক্ষীস্বরূপ "করুণাময়ী ঘাট" নামে অভিহিত একটি প্রাচীন ঘাটের সামান্য কিছু ভগ্নাবশেষের চিহ্ন এখানে এখনও বিদ্যমান রয়েছে দেখতে পেলাম। এই ঘাট পর্যন্ত এসে আমাদের পায়ে চলা পথটি শেষ হল। আমরা তখন ঘাটের পাশে একটি নিভৃত জায়গায় বসে বিশ্রাম নিতে নিতে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে চারিদিক ভাল করে নিরীক্ষণ করছিলাম। দেখলাম, ঘাটের পাশেই রয়েছে একটি প্রাচীন পরিত্যক্ত শ্মশান, নাম হল "সিদ্ধেশ্বরী শ্মশান"। মায়ের নামে শ্মশান, সুতরাং আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, সিদ্ধেশ্বরী নামে কোন দেবী নিশ্চয়ই ঐ শ্মশানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে আগ্রহভরে দ্রুত এগিয়ে যাই শ্মশানের দিকে, গিয়ে দেখি আমাদের অনুমান বাস্তবিক সত্যি, শ্মশানের মধ্যস্থলে একটি অনাড়ম্বর মন্দিরের মধ্যে মা সিদ্ধেশ্বরী বিরাজ করছেন স্ব-মহিমায়। মন্দিরের একপাশে উঁচু একটি স্থান বাঁধানো জায়গায় রয়েছে ত্রিকোণাকৃতি একটি যজ্ঞকুণ্ড, আর তার সম্মুখস্থ আঙিনায় প্রোথিত রয়েছে বলিদানের জন্য একটি ছোট্ট হাড়িকাঠ। এখানকার দর্শনীয় সবকিছুর মধ্যে একটা প্রাচীনত্বের আভাস যেন সহজেই চোখে পড়ে। তবে সবকিছু দেখে আমাদের মনে হল বৎসরান্তে কেবল কালী পূজোর দিন ছাড়া অন্য কোনদিন উক্ত হাড়িকাঠে ও যজ্ঞকুণ্ডে পূজার কোন আনুষ্ঠানিক কর্ম মোটেই করা হয় না। তবে মন্দিরে মায়ের নিত্য পূজাটি কোনমতে সমাধা করা হয় এটা বোঝা গেল। যাই হোক আমরা এই সিদ্ধেশ্বরী মাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে শ্মশান থেকে বেরিয়ে পুনরায় উৎফুল্ল মনে এগিয়ে গেলাম অপর আরেকটি নতুন দ্রষ্টব্যের সন্ধানে।

কিছুটা পথ এগিয়ে যেতেই আমরা দেখতে পেলাম বাদল শিব মন্দির-যুক্ত মায়ের একটি সুরম্য মন্দির। বলা বাহুল্য এটিও হল মা কালীর মন্দির। মন্দিরে প্রবেশ করার পূর্বে আমরা স্থানীয় একটি লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, এখানকার মায়ের নাম হল "করুণাময়ী", আর মায়ের নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নাম হয়েছে "করুণাময়ী" বা "করুণাময়ীতলা"। এই মন্দিরটি হল বড়িষার জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত। উক্ত ভদ্রলোকটির কাছ থেকে এই স্থানটির ও মন্দিরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানার পর আমরা অত্যন্ত উৎসুক মন নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলাম মন্দিরের দিকে। সামান্য কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার মুখে ফটকের উপরে তোরণের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। দেখলাম, তোরণের উপরে ইংরাজী ও বাংলাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে "মা করুণাময়ী কালী মন্দির" স্থাপিত ১৬১০ "আদিকালী"। লেখাটি পড়বার পর আমরা ভাবলাম, আমাদের এই কলোলিনী কলকাতা মহানগরীর গোড়াপত্তন হয় ১৬১০ সালে, আর এই ১৬১০ সালেই মা করুণাময়ীর এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে দেখছি, কলকাতার তিনশো বছরের সঙ্গে সঙ্গে এই করুণাময়ী মায়ের মন্দিরের প্রতিষ্ঠার বয়সও আজকে দীর্ঘ তিনশো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এই তিনশো বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা তিলোত্তমা মহানগরী কলকাতার যে একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য হল তিনশো বছরের প্রাচীন এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক মন্দিরটি—একথা আমাদের অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে। সেদিন ভ্রমণে বেড়িয়ে শহরের উপকণ্ঠে এইরকম একটি মনোরম গৌরবময় নিদর্শনের সন্ধান যে পাব তা আমরা কখন ভাবতে পারিনি। গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠল, মনে মনে আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। সুতরাং

আর বৃথা সময় নষ্ট না করে উক্ত মন্দির ও দেবী দর্শনের জন্য আমরা অধীর চিত্তে দ্রুত মন্দিরের দিকে পা বাড়ালাম।

আমরা যখন মন্দিরের কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম, তখন একজন মধ্যবয়সী সুদর্শন লোক হাসিমুখে মন্দির থেকে বেড়িয়ে এসে আমাদের দু'জনকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাঁদের এই মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জন্য। অপরিচিত সেই লোকটির এইরূপ সুন্দর সহৃদয়পূর্ণ আন্তরিকতায় আমরা খুবই মুগ্ধ হলাম। লোকটির পরনে ছিল সাদা ধোতির উপর চওড়া লালপাড় ধুতি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে বড় একটি সিন্দুরের টিপ, পায়ে একজোড়া খড়ম। লোকটি যে মায়ের একজন সেবক তা তাঁর এই পবিত্র বেশভূষা ও অঙ্গসজ্জা দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা লোকটিকে অনুসরণ করে সানন্দে তাঁর পাশে মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, মন্দিরটি খুব একটা উঁচু নয় এবং কোন রকম অলঙ্করণও করা নয়, তবে তার প্রাঙ্গণটি খুবই প্রশস্ত। মায়ের মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থলে হাড়িকাঠ পোতা বলিদানের জন্য নির্ধারিত একটি ছোট স্থান রয়েছে দেখলাম। মায়ের মন্দিরকে মাঝখানে রেখে প্রাঙ্গণের দুইপাশ ঘিরে রয়েছে ছাদশ শিবের মন্দির। সহজেই সবার চোখে পড়বে শিব মন্দির সহ মায়ের এই মন্দিরটি বর্তমানে নব নির্মিত। তবে বারোটি শিব মন্দিরের মধ্যে প্রথম সারির ছয়টি শিব মন্দিরের নির্মাণের কাজ সম্প্রতি সমাপ্ত হলেও বাকি দ্বিতীয় সারির ছয়টি শিব মন্দিরের নির্মাণের কাজ কিন্তু এখনও শুরু হয়নি। সেগুলি পূর্বেকার আটচালা শৈলীর প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে এখনও কোন রকমে টিঁকে আছে। বলা বাহুল্য, সমস্ত মন্দিরগুলি যে অতীব প্রাচীন তার সাক্ষীস্বরূপ আমরা বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য রীতির অনুকরণে নির্মিত আটচালাবিশিষ্ট বাকি এই জরাজীর্ণ ভগ্ন শিব মন্দিরগুলি দেখে তা স্পষ্ট বুঝলাম। এরপর আমরা বিস্তৃত প্রাঙ্গণটি পার হয়ে পাথরের কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে মায়ের সেই সেবকের সঙ্গে মন্দির অভ্যন্তরে এসে প্রবেশ করলাম। মন্দিরে ঢুকে একেবারে মায়ের সামনে নিয়ে গিয়ে তিনি আমাদের দু'জনকে সযত্নে বসালেন। তারপরে সস্নেহে আমাদের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে আসা হচ্ছে? পথে কোথাও কোন কষ্ট হয়নি তো? তাঁর এই অপূর্ব সরলতায় আমরা অত্যন্ত অভিভূত হলাম। আমরা তখন তাঁকে সবিনয়ে জানালাম, "আমরা এই কলকাতাতেই থাকি, ছুটির দিন বলে আমরা একটু বেড়াতে বেড়িয়েছি। প্রায়ই ছুটিতে আমরা বাসে অথবা ট্রেনেতে করে কলকাতার বাইরে বেড়াতে যাই, তাই এবার আমাদের কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলেতে বেড়াবার বিশেষ ইচ্ছা হওয়ায় পুরোন এই আদিগঙ্গার ধার ধরে বেড়াতে বেড়াতে আমরা সরাসরি আপনাদের এখানে এসে পৌঁছে গেলাম। সত্যি আমাদের বড় ভাল লাগছে আপনাদের এই শান্ত পরিবেশময় সুন্দর মন্দিরটি। আমরা ভাবতে পারিনি যে কলকাতার এত কাছে এইরকম একটি মনোরম মন্দির দেখতে পাব। কিন্তু আজকে জানলাম যে, এই কলকাতার আশেপাশে আজও এইরকম কত ঐতিহাসিক মন্দিরাদি ছড়িয়ে আছে তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। যাক্ এখন আপনাদের এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে যদি আমাদের কিছু বলেন তাহলে আমরা খুবই আনন্দিত হব জানবেন।" এই বলে আমরা যখন চুপ করলাম, তখন দেখলাম, সেই ভক্ত সেবকের দু'চোখ যেন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি অত্যন্ত পুলকিত হয়ে আমাদের দু'জনকে সাগ্রহে বললেন, "বলবো বৈকি, নিশ্চয়ই বলবো। তোমরা এত আগ্রহ নিয়ে মাকে দর্শন করতে এসেছো আর সেই মায়ের প্রতিষ্ঠার কাহিনী আমি তোমাদের শোনাব না তা কি কখন হয়? আমি যে মায়ের কাছে অপরাধী হয়ে যাব।" এই বলেই মায়ের সেই ভক্ত সেবক

মাকে করযোড়ে প্রণাম করে পরক্ষণেই মা করুণাময়ীর মন্দির প্রতিষ্ঠার কাহিনী আমাদের কাছে সাগ্রহে বলতে শুরু করলেন। আর আমরাও তখন মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর কথিত সেই রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক কাহিনী এক মনে বসে শুনতে লাগলাম।

আজ থেকে দীর্ঘ তিনশো বছর আগেকার কথা। তৎকালীন যাঁরা ছিল এই কলকাতার বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক, এবং যাঁদের কাছ থেকে এক সময় ইংরেজেরা কলকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম কিনেছিলেন, সেই ধনাঢ্যতম জমিদার বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের বংশানুধ্যা ইষ্টদেবী হলেন এই মা করুণাময়ী। এঁদেরই জনৈক পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পবিত্র আদিগঙ্গার তীরে মাকে সাধনে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আমি তাঁদেরই একজন অধস্তন বংশধর। মায়ের আদেশপ্রাপ্ত হয়ে আমরা বংশানুক্রমে মায়ের সেবা করে চলেছি। আমাদের এই বিরাট সাবর্ণ বংশে মায়ের শুভ আবির্ভাব সম্পর্কে একটি সুন্দর অলৌকিক কাহিনী আছে। কাহিনীটি কারো কারো কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও জানবে অধিকাংশ লোকের কাছে কিন্তু তা আজও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে আছে। ইতিহাস অন্তত তাই বলে। জানবে, মা এখানে আজও জীবন্ত হয়ে আছেন। শোনো বলি, এক সময় আমাদের এই সাবর্ণ বংশে একজন শক্তিমান সাধকের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি অতি ছেলেবেলা থেকে একাগ্র মনে মায়ের সাধন, ভজন করতেন। বলা বাহুল্য আমাদের বংশের উক্ত সাধক ছিলেন একজন অতি উচ্চ স্তরের মাতৃ উপাসক। একদা এই সাধকেরই আকুল আহ্বানে মা করুণাময়ী স্বয়ং তাঁর কন্যারূপে আমাদের এই বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সংক্ষেপে কাহিনীটি হল এই, উক্ত গৃহীসাধকের এক সময় একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, তার নাম রাখা হয়েছিল 'করুণা'। রূপে, গুণে অতি অতুলনীয়া ছিল সেই কন্যা। কিন্তু বিধাতার করুণ বিধিলিপি, আমাদের সবকিছু আনন্দে বাদ সাধলো। দেখা গেল, সেই কন্যা পাঁচ বছর বয়স হতে না হতেই সবার মায়া কাটিয়ে একদিন এই ভব সংসার থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেল। অকস্মাৎ কন্যার এই অকাল মৃত্যু হওয়ায় সেই সাধক লোকে অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়লেন। কোন সান্ত্বনায় তাঁকে শান্ত করা যায়নি। ফলে এক সময় তিনি কন্যার এই করুণ বিয়োগ ব্যথা সহ্য করতে না পেরে আদিগঙ্গায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবার সঙ্কল্প করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁকে আর প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়নি। শোনা যায়, যেদিন তিনি এই আদিগঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেবেন, ঠিক তার আগের দিন শেষ রাত্রে তিনি একটি অপ্রত্যাশিত স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখলেন, তাঁর সদ্য মৃতা কন্যা তাঁকে এসে বলছে, "বাবা, কেন তুমি আমার জন্য কেঁদে কেঁদে অযথা ব্যাকুল হচ্ছ? আমি তো সব সময়ে তোমার কাছে কাছে রয়েছি তা কি তুমি বোঝ না। শোন, আমার জন্য দুঃখে তোমায় আর অশ্রুপাতী হতে হবে না। আজ রাত্রি প্রভাত হতেই তুমি সোজা চলে যেও আদিগঙ্গার তীরে। সেখানে গঙ্গার পশ্চিমকূলে দেখতে পাবে একটি বট গাছ। এই প্রাচীন বট গাছের নীচে যুগ যুগ ধরে রক্ষিত আছে একটি ব্রহ্মশীলা। এই পবিত্র ব্রহ্মশীলার মধ্যেই আমি বহু যুগ ধরে আবদ্ধ হয়ে আছি। আমার আদেশ, তুমি সত্বর ঐ ব্রহ্মশীলা দিয়ে নির্মাণ করো তোমার ইষ্টদেবীর প্রতিমূর্তি। জানবে, আমি তোমার নির্মিত ঐ প্রতিমূর্তির মধ্যেই তোমার আদরের কন্যা রূপে চিরদিন তোমার কাছে বাঁধা হয়ে থাকবো। এই কথা ক'টি বলার পর দেখা গেল তাঁর কন্যার মূর্তি আর সেখানে নেই, তার পরিবর্তে সেখানে রয়েছে তাদের বংশের ইষ্টদেবী স্বয়ং মা কালীর এই পরম রমণীয় করুণাময়ী মূর্তি। কন্যার এই মহাঅলৌকিক স্বপ্ন দর্শনে সাধক আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন। স্বপ্নের মাধ্যমে এই পরম আনন্দ সংবাদ পেয়ে তিনি অধীর চিত্তে রাত্রি প্রভাত

হতেই ছুটে এলেন সেই তীব্রস্রোতা পবিত্র আদিগঙ্গার পশ্চিমকূলে। এসে তিনি সত্যি সত্যিই দেখলেন, গঙ্গার তীরবর্তী বটবৃক্ষের নীচে পড়ে রয়েছে তার সেই স্বপ্ন নির্দিষ্ট ব্রহ্মশীলা। আনন্দে পুলকিত হয়ে অক্লপূর্ণ নয়নে মা-মা বলে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাধক সেই ব্রহ্মশীলার উপর। একদা যে প্রস্তরীভূত শীলার মধ্যে অনাদিকাল থেকে লুকিয়ে ছিল তাদের ইষ্টদেবীর মহাপ্রাণ। এইভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে উক্ত শিলাটি পাবার পর সাধক সেই জাগ্রত মহাশিলা দিয়ে সেই মুহূর্তেই মায়ের এই স্বয়ম্ভূ মূর্তি নির্মাণের শুভ সঙ্কল্প করলেন। এক পরম শুভদিনে সাধক মায়ের প্রেরিত অনেক ভক্ত শিল্পীকে দিয়ে নির্মাণ করালেন মায়ের এই অপূর্ব নয়নাভিরাম করুণাময়ী মূর্তি। পরে এক শুভ সন্ধিক্ষণে সাধক মা করুণাময়ীর এই শিলাময়ী মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে মাকে জাগিয়ে তুললেন। আর সেই থেকে মা তার প্রিয় কন্যারূপে জাগ্রত হয়ে সেই মহাশিলায় হয়ে রইলেন চির আবদ্ধ। চিরদিনের তরে হারিয়ে যাওয়া তার সেই পরম আদরিণী কন্যাকে এইভাবে পুনরায় মায়ের মধ্যে ফিরে পেয়ে সাধক যেন আনন্দেতে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। প্রতিদিন তিনি তাঁর অন্তরের ভক্তি অর্ঘ দিয়ে প্রাণ ভরে করতে লাগলেন কন্যারূপী মা করুণাময়ীর পূজা। পরে এইভাবে কিছুকাল মহা আনন্দে কাটাবার পর ঈশ্বরের অমোঘ নিয়মানুযায়ী একদিন এই সাধক সজ্ঞানে মাতৃনাম করতে করতে মায়ের চরণে নিলেন চির আশ্রয়। বংশের শ্রেষ্ঠ সুসন্তান সেই সাধক মায়ের সেবাতে সেদিন এইভাবে নীরবে চির বিদায় নিয়ে গেলেন সত্য কিন্তু তিনি আমাদের এই দেশ ও দশের জন্য রেখে গেলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অমর কীর্তি, যা আজও তাঁর সেই সাধনাময় পুণ্যস্মৃতিকে বহন করে সগৌরবে আমাদের এই কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর বুকে দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিন মায়ের প্রতিষ্ঠার এই চমকপ্রদ অলৌকিক কাহিনীটি বলার পর, মায়ের সেবক তাদের মন্দির ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে পরে আরও অনেক কিছু অজানা তথ্য আমাদের সাগ্রহে জানিয়েছিলেন। যা এ প্রসঙ্গে বলার প্রয়োজন আমি কোন মতে সংবরণ করতে পারলাম না। শোনা যায় বহু কাল আগে নয়টি চূড়াবেষ্টিত ও পোড়ামাটির টেরাকোটার অপূর্ব অলংকরণে সজ্জিত দ্বাদশ শিব মন্দিরযুক্ত মায়ের একটি বিরাট মনোরম মন্দির এখানে ছিল, যার প্রমাণ স্বরূপ উক্ত দ্বিতীয় দফার মন্দির নির্মাণের সময় মাটির নীচ থেকে পূর্বের মন্দিরের কিছু ধ্বংসাবশেষের মূল্যবান নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, বাদশাহী ও ইংরেজ আমলের কতকগুলি পুরাতন বিভিন্ন ধাতুর মূল্যবান মুদ্রা এবং কতগুলি সুন্দর নক্সা কাটা ইট, পাথর ও নানা দেব-দেবীর কয়েকটি ভগ্ন মূর্তি ইত্যাদি। এই সকল প্রাচীন পুরাকীর্তিগুলি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই মন্দিরটি হল অতীব প্রাচীন ও ঐতিহাসিক।

আজকে এক চূড়াবিশিষ্ট নবনির্মিত মায়ের যে সুরম্য মন্দিরটি আমরা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি তা হল কিন্তু সাম্প্রতিক কালের তৈরী। তবে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মায়ের এই শিলাময়ী মূর্তিটি দীর্ঘ তিনশো বছরের প্রাচীন। মায়ের এই মূর্তি গঠনের একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য আছে যেটা সত্যি লক্ষ্য করার মত। সম্পূর্ণ একখণ্ড কষ্টিপাথর থেকেই মহাকাল ও তার বুকে দাঁড়ানো মহাকালীর এই অনুপম মূর্তিটি শিল্পীর সুনিপুণ হস্তে খোদাই করে নির্মাণ করা হয়েছে। অনেকের অভিমত এই মূর্তিটির মতই নাকি রাজা প্রতাপাদিত্যের বংশানুযায়ী যশোরেশ্বরী কালী মূর্তির অনেক মিল আছে। আর এ ছাড়াও হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার নিস্তারিণী কালীমাতা এবং কলকাতার নিমতলা ঘাটস্থিত প্রাচীন আনন্দময়ী কালীমাতার সঙ্গেও এই করুণাময়ী কালীর প্রচুর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

এক সময় কলকাতার বহু বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও কোম্পানীর আমলের বহু উচ্চপদস্থ আমলাগণ সাবর্ণদের এই মন্দিরে এসে মায়ের কাছে নানা মানত করত এবং ঘটা করে মাকে নিয়মিত পূজা দিত। সে সময় এই অঞ্চলে লোক বসতি ছিল খুবই কম। আর এই স্থানটি ছিল খুবই নির্জন ও গভীর জঙ্গলে আবৃত। তখন এই পুণ্যতোয়া আদিগঙ্গাও ছিল খুবই প্রশস্ত ও খরস্রোতা। এই গঙ্গা মন্দিরের পা দিয়ে আপন মনে কুল কুল শব্দে বয়ে চলত। এই তরঙ্গময়ী পুণ্যসলিলা গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকা করে সে সময় বহু যাত্রী যেত নানা তীর্থে ও বিভিন্ন গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। পরে এই যাত্রীরা সকল যাত্রাপথে এই মা করুণাময়ী কালীকে দর্শন করে তাদের নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী পূজো দিয়ে পুনরায় তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যেত। আবাহমানকাল ধরে তাদের এই তীর্থ দর্শন রীতি যথা নিয়মে চলে আসছিল। কিন্তু কালের অমোঘ পরিবর্তনে এসবকিছুই আজকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

সাবর্ণ চৌধুরীদের এই ঐতিহাসিক করুণাময়ী কালী কলকাতার সকল অধিবাসী ভক্তদের কাছে "আদ্যকালী বা আদিকালী" নামে বিশেষ পরিচিত হয়ে আছেন। তাঁরা বলেন, আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত এই হল কলকাতার একমাত্র প্রাচীন "আদিকালী"। তাই বাঙালীদের মত তারাও আজকে দলে দলে তাদের অন্তরের ভক্তির অর্ঘ নিয়ে ছুটে আসছেন এই করুণাময়ী মায়ের কাছে। মায়ের অযাচিত করুণা ও আশীর্বাদ লাভের জন্য তারা মন প্রাণ ভরে মাকে ডাকছেন। ধন্য করছেন তাদের জীবন। আজও যেন বিরাম নেই তাদের এই মন্দিরে আসার।

করুণার চিরমূর্ত প্রতীক এই করুণাময়ী মা হলেন এখানে যুগ যুগ ধরে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে মহিমায় আসীনা। সকল ভক্তগণের মনে দৃঢ় ধারণা এই মন্দিরের চত্বরের মধ্যে আজও কোথাও সেই জাগ্রত পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। সম্ভবতঃ দেবী মূর্তির বেদীর নীচে এই মহাপবিত্র আসনটি স্থাপিত হয়ে থাকবে। আজকে এই মা করুণাময়ী হলেন চির কল্পতরু। সুতরাং এই মায়ের অপার করুণা থেকে কেউ কখন বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায় না। তিনি তার সকল ভক্তসন্তানগণের মনোবাঞ্ছা সদা পূরণ করে থাকেন। তাই তো তিনি হলেন আমাদের সকল মনোবাঞ্ছা পূরণকারী পরমা জননী।

আজকে আমাদের এই মা পরম আনন্দময়ীরূপে এখানে এক মহাআনন্দের হাট বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি তার অপার করুণায় বিগলিত হয়ে তাঁর শত শত ভক্ত সন্তানদেরকে সযত্নে কাছে ডেকে এক পরম শান্তি ও বরাভয় দান করে চলেছেন। তাই আজও অসংখ্য ভক্ত মায়ের এক দুর্নিবার আকর্ষণে নিত্য মায়ের কাছে এসে থাকেন। তারা সদা মায়ের কৃপা ও আশীর্বাণী লাভের জন্য এই মায়ের কাছে জানান তাদের অন্তরের মনোকামনা। আর মা-ও এক সময় সত্য সত্যই পূর্ণ করেন তাদের সকলের হৃদয়ের ব্যাকুল মনোবাসনা। নিরাশ হয় না কেউ, ক্ষিপ্ত হয় না কেউ, এমন কি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিমুখ হয়ে ফিরে যায় না কেউ। মনে প্রাণে যত ডাকা যায় মায়ের দুর্লভ দর্শন ও করুণা লাভ করে। চির সার্থক হয় তাদের জীবন এই মাকে পেয়ে। মা যে হলেন চির নিত্যা, আদ্যা ও জগদ্ধাত্রী এবং সর্বোপরি পরম স্নেহময়ী বিশ্বজননী।

সেদিন মন্দিরে বসে মায়ের সেবকের কাছ থেকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কলকাতার আদিকালী করুণাময়ী মায়ের এই অতীত ইতিহাস শোনার পর আমরা সত্যি খুবই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। মায়ের প্রতি বিপুল ভক্তি ও আনন্দের বন্যায় আমাদের চোখ দুটি জলে ভরে এল। আমরা সজল নয়ন দুটি বুজতেই মায়ের অপার করুণায় আমাদের হৃদয়-মন্দিরে মাকে

পুনরায় পরিপূর্ণভাবে দর্শন করলাম। আর সেইসঙ্গে আমাদের রোমাঞ্চময় দেহে ও মনে আমরা যেন করুণাময়ী মায়ের এক দুর্লভ করুণার কোমল স্পর্শও অনুভব করলাম। সত্যি ধন্য হল আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন, আর সার্থক হল আমাদের আজ এই মায়ের কাছে আসা। এইভাবে সেদিন সেই পরম শুভক্ষণে আনন্দ অশ্রু দিয়ে করুণাময়ী আনন্দময়ী মায়ের চরণ ধৌত করে তাঁকে আমাদের অন্তরের শতকোটী ভক্তিপূর্ণ বিনম্র প্রণাম জানিয়ে আমরা মনে এক অনাবিল শান্তি ও আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

উৎসবে

বাংলার ঐতিহ্যকে

সমৃদ্ধ করুন

তন্তুশ্রী, তন্তুজ এবং মঞ্জুষা

বাংলার তাঁত এবং হস্তশিল্পের এক অপরূপ সংকলন।

আর

চর্মজ-র

জুতোর দোকানে দেখতে পাবেন

নিপুণ শিল্পের নিদর্শন—

বেছে নিন যেটি আপনার মনের মত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

"খাদি জনতার সেবা করে—খাদি কিনুন"—গান্ধীজী

গান্ধী স্মারকনিধি, বাংলা

১৪, রিভারসাইড রোড, পোঃ অঃ—বারাকপুর, ২৪-পরগণা

খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন অনুমোদিত খাদিভবন থেকে সূতী-খাদি, সিল্ক-খাদি বস্ত্র এবং গ্রামোদ্যোগী জিনিষপত্র কিনে পল্লীবাংলার দরিদ্র কাটুনী ও অন্যান্য কারিগরদের অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন।

—: প্রাপ্তিস্থান :—

গান্ধী স্মারকনিধি খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনসমূহ

(১) ৮৯, এস. এন. ব্যানার্জী রোড,
চিড়িয়ামোড়, বারাকপুর,
২৪ পরগণা।

(২) ৩৮, অরবিন্দ রোড,
নৈহাটি,
২৪ পরগণা।

(৩) ৫৮, কে. এম. শা ষ্ট্রীট,
শ্রীরামপুর, হুগলী।

(৪) সামন্ত বাজার
সিউড়ী, বীরভূম।

(৫) ৫৭/এ/৩, জি. টি. রোড,
কালীতলা, শ্রীরামপুর,
হুগলী।

(৬) ১১/২ নরসিংহ দত্ত রোড,
কদমতলা,
হাওড়া।

(৭) জি. দাস বিল্ডিং
১২, রেল গেট
বারাসাত, জেলা - ২৪পরগণা।

তাঁবু

ব্রত চক্রবর্তী

২.

প্রত্যেক তাঁবুরই নিয়মকানুন আলাদা।
কিন্তু অভুক্তি আর আত্মতুষ্টি
প্রায় প্রত্যেক তাঁবুতেই বাধ্যতামূলক।

৪.

প্রত্যেকে যখন যোকায় শুধু সেখানে ছাড়া
আর কোথাও এমন শান্তি ও নিরাপত্তা নেই,
আমি তখনগ্রাম্য-স্রোতারভূমিকানিতেনিতে ভাবি:
কথাটা কতদূর পর্যন্ত সত্যি অন্তত তা জানার জন্য।
আমার যাওয়া উচিতএক থেকে ভিন্নভিন্নতাঁবুতে।

□

অমরাবতীর দুটি ফুল

পলাশ মিত্র

পার্কের দক্ষিণ ফুটপাতে
ওই শিশুটির খেলা দেখছি বিস্ময়ে।
রেলিঙের ধারে নাচতে নাচতে
হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের কোলে :
মা বলেন : ছাড়্ বাবা ছাড়্
এখুনি ৪-মুঠো না কোটালেই নয়,
দেখছিস না কালো হয়ে আসছে আকাশ
ছাড়্ বাবা সোনা মাণিক আমার।

রাস্তা দিয়ে হুস্ হুস্ চ'লে যাচ্ছে গাড়ি।
গাড়ির কালো ধোঁয়ায় ভ'রে যাচ্ছে শিশুর মুখ :
আধুনিক সভ্যতা শিশুর বুকে জমা করছে বিষ।
হঠাৎই একটা গাড়ি খারাপ হয়ে
থমকে দাঁড়ালো পার্কের দক্ষিণে :
একেবারে সেই ফুটপাতের ধারে।
গাড়ির মধ্যে বসে-থাকা এক শিশু
হাসতে লাগলো হাত নেড়ে।
ফুটপাতের শিশুটিও হাসিমুখে এগিয়ে আসে।

দু'জনের মুখেই অমলিন নিরুপম হাসি
অমরাবতীর দুটি ফুল পার্কের এই পাশে।
গাড়ির ভিতরে অপাপবিদ্ধ শিশু
ফুটপাতে কালিঝুলি-মাখা ছোট্ট মহাদেব :
মধ্যিখানে কাচের দেওয়াল।

□

এক মুহূর্ত

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

স'ন্তাক্রু বাঘের মতো
মেঘ ঠেলে, লাফ দেয় চাঁদ।
এখুনি একটা কিছু হবে, মনে হয়।

দুটো ডিঙ্গি পাশাপাশি প'ড়ে আছে—
ঢেউয়ের চুমোয় তারা পাগলের মতো
যাবে কি যাবে না, ঠিক বুঝতে পারে না
এখুনি একটা কিছু হবে মনে হয়।

□

তপস্বিনী

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

অপেক্ষাকুসুম তুমি ফুটে আছ বহুদিন ধরে,
ক্লান্তির কুয়াশা আছে, রোদ আছে, জলঝড় আছে,
পাপড়িতে রয়েছে লেগে দু-একটি এলোমেলো দাগ—
পানের বরজে ছায়া তোমাকে টানটান রেখে দিল।

প্রকৃতি শূন্যতা বাকি একদম সইতে পারে না
সহানুভূতির সব বাতাসেরা ঠিক ঢুকে পড়ে—
এই তো মলয়গন্ধ হাওয়া এলো—অর্ণবের ঢেউ—
তুমি শান্ত তপস্বিনী ফুটে আছ অপেক্ষাকুসুম।

যার জন্যে বসে আছ সে রয়েছে কাছে, পাশাপাশি,
তাকে তুমি ছুঁয়ে আছ—সে তোমারই—সম্পূর্ণ তোমার—
তার বুকে তোমারই সোনালি নাম আছে উল্কি করা—
অপেক্ষা কুসুম তুমি ফুটে আছ তারই অপেক্ষায়।

সে আছে নিশ্চিন্ত হয়ে নিরুৎকণ্ঠ—সে যে নিরুদ্বেগ
সে তোমারই ভালবাসা—জানো তুমি অথচ বোঝ না···

□

জীবন ছুঁয়েছে এক নদী

শুভঙ্কর রায়

জীবন ছুঁয়েছে যেন নদী
অনন্ত দূর্বার স্রোত
বিষণ্ণ জীবনের কবিতার পাতে
আজ কত ঘাস গন্ধ রূপ উজ্জ্বলতা।

শরতের সেই সব প্রসন্নতা কোথা
কোথা সেই বিপন্ন অস্থিরতা
কোথা সেই খেলাঘর, কোমল বাতাস
কোথা সেই ঝিরঝির বেদনা নির্যাস।

পথের ধুলোতে সব দুর্বাক্ষর দিন
অনন্ত শীতের মত মন ঢুকে আছ
তোমাকে ভুলিনি আমি, কিছুতে ভুলিনি
প্রাণ ছুঁয়ে আছো আজ চৈত্রের মাঠে।

জীবন পেয়েছে আজ নদী
বিদ্রোহ রক্ত তো থামেনি
সেই ছবি আজাকুঁড় রক্তে জেগে আছে
নদীর মাঝনে তার পলক নড়েনি।

□

গ্রীষ্মের আকাশ

অনুরাধা মহাপাত্র

ঘুমের ভিতরে আজ সন্ধ্যাবেলা খোকাদের শরীরে এসেছি
খোকারা গায়ে গায়ে শ্বেতকরবীর ফুল, ঘুমের গানের ধ্বনি
সুদূরই নয়, তবু, গ্রীষ্মের মতোন আকাশ, আমাদের পৃথিবীতে
মৃত্যুর কিছু মায়া, ভালোবাসা পাওয়া এই সন্ধ্যাবেলায়
চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।
খোকাদের কাউকে আমি হাত ধরে নিয়ে গেছি জলের ভিতরে
তৃতীয়ার চাঁদ পেছে খোকাদের কপালে মিশেছি
মধুর সবুজে ঘন ছায়া, গ্রীষ্মের আরতিতে পথ হেঁটে চলা
খোকার চোখের ভিতর জ্বলে ভেনাসের চোখ
বুধ আর বৃহস্পতি খোকার হৃদয়ে জ্বলে নিরবধিকাল
করবীর পরাগের মতো আজ খোকাদের হাসি
গ্রীষ্মের কোলে সব পাখি—যারা ডানা ভাঙা,
এক চোখ অন্ধ যাদের, নীড় ভাঙা, মুক্ত নীড় জাগা
অন্ধকারে আলোর ঘুমায়
গ্রীষ্মের মুক্ত কেশদামে আমাদের মৃত্যুবোধ, সুখ-দুঃখ, চেনা ও অচেনা রচনা,
সীমা ও অসীমের মন্ত্রণাগারে
গভীর গভীরতর মেঘে ঢেকে আছে।
সমস্ত প্রাচীন গান, আরো প্রাচীন গল্প আমাদের দুজনের হৃদয়ে এসেছে।
কে কোথায় যাবো,
ঠিক নেই তবু খোকাদের হাত ধরে, শ্বেত করবীর স্বর্গে কখন এসেছি।

□

সময়

গৌতম মুখোপাধ্যায়

তোমার নয়, আমার নয়
সময় তবে কার ?
সময় তবে উহার।
উহার রোমশ বুক, চওড়া কাঁধ, কঠিন পরুষ হাত
ছিঁড়বে কলার, নাট বল্টু, তবুও সময় উহার।
উহাকে দাও ঘানির তেল চেঁকি ছাঁটা চাল।
পড়বে ঘাম, কিন্তু উহা হয়ত মোক্ষ সওয়ার
ভাবীকালের। সেদিন আমার লাশ
আটকে যেন যায়রো দখি, মাতগঙ্গার বন্দরে।

এসবে কি এসে যায়

স্বপন বসু

হোক, বল এসবে কি এসে যায়
এসবে কি এসে যায়
কটা মুদ্রাদোষ ম'ল কি বাঁচল
এসবে কি এসে যায়
সামনে আপেল-পাকা উমাবউ
সুখের খুশবু ছড়ায়
বরং এই তো ভাল
একটু কবিতা একটু গান
সবদিকই রইল বজায়
বাঁচল ঘন ঘান উমান
তার চে' আয় ভাই
আমরাও একটু লড়াই লড়াই খেলি
লকুনির এই পাশা খেলায়
আমরা সব বাবু-যুধিষ্ঠির
অনাথ নাথবতী-দেশটাকে বাজি পণ
জানি তো কোন কৃষ্ণ
বাড়িয়ে দেবে না হাত
স্থির অন্ধ বিচারক ধার্তরাষ্ট্রী সমাজ
তাই তো বলি
জানি ফুলকি ছড়ায় ফুলকি ছড়ায়
শেষ ধর্মযুদ্ধে
সব শ্মশান সব সমান
তবুও যতক্ষণ শ্বাস
ততক্ষণ
ততক্ষণ দোল খেতে খেতে
দোল খেতে খেতে……

আমিও নেতা, তুমিও নেতা

মণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

আমিও নেতা, তুমিও নেতা।
আমি এ দলের, তুমি ও দলের ;
প্রতিদ্বন্দ্বী দুজনের কী সুখের জীবন।
প্রতিষ্ঠিত আমরা দু'জন।

আমাদের দু'জনের এক মন, এক ভাষা,
এক কাজ, এক ভাষা ;
বাহিরে আমরা করি দলাদলি,
ভিতরে দু'জন করি গলাগলি,
একই হোটেল, একই মোটেল,
মতবন্ধু করি দু'জনেই।

আমাদের দেশভক্তি জনসেবা
নিত্য নব চাতুরীতে ভরা।
আমরা দালাল, আমরা চতুর ;
তোমরা সরল, তাই হ'য়েছ কত্তুর।

আমাদের ছবি এক—কালো রঙ তাতে—
নির্বাচন, কমিশন, উৎকোচ গ্রহণ
মাঝে মাঝে এখানে সেখানে
কিছে ভাটি যখন তখন।
স্বার্থান্বেষী আমরা দু'জন।

আমাদের কাজে ও কথায়,
মিল পাবে না কোথাও। ধর্ম কি—
জানি না আমরা। তাই নিয়ে তবু
করি টানাহানি, রব টানাটানি,
মারামারি, রক্তপাত।
মন্দিরে-মসজিদে শুনি অশুভ সংবাদ,
নিরন্ন মানুষের উঠে দীর্ঘশ্বাস।
রসাতলে যায় দেশ। যাক্।
তবু থাক্
মনুষ্যেতর বয়ঃপ্রাপ্ত ঘাস আর মাঠ,
নির্বোধ জনতার অর্থহীন ধ্বনি ঐ—
'জয়হিন্দ্'। 'জিন্দাবাদ'!

□

অপরাধ

তাপস মিত্র

তোমায় কাছে এনেছি
এই আমার অপরাধ।
প্রতিদানে একি দিলে!
যন্ত্রণা, ঘৃণা। মৃত্যু
ছাড়া নেই কোন পথ।
হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই
এই আমার অপরাধ।
অন্ধকারে ছিলে,
কোথাও কেউ নেই
দুর্যোগ সে এক রাত্রি;
আজ মনে নেই।
দিয়েছি উজাড় করে
যা ছিল আমার।
আজ যে নিঃস্ব আমি
এই আমার অপরাধ।

□

সূর্য অস্তাচলে

পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়

ভীতসন্ত্রস্ত ভাঙে ঘুম
আশপাশ সব নিঃঝুম
এ এক নিদারুণ যন্ত্রণা
বক্ষে দাবদাহ নিয়ে ঘুম আসে না
দেখি আমায় দেখছে এখন স্বপ্নে
নাকি ঘুমিয়ে চিৎ হয়ে
না জানি-প্রিয়ারও মুক্তি নেই
আমার মনেও তৃপ্তি নেই
তাই মাঝরাতে চোখে ঘুম নেই
কেউ ঘুমন্ত কথা বলে
কেউ ঘুমন্ত হেঁটে চলে
অথচ ঠিক সময়ে সূর্য অস্তাচলে চলে যায়।

□

অজানায়

আনন্দ বাসন্তত

ভালবাসা এবার তোমার সাথে
আমার আড়াল হোল—
তোমার স্মৃতিস্পর্শে
মমতার উজ্জ্বল বাতী,
পরশপাথর আশ্চর্য। যাদুকাঠির ছোঁয়ায়
তুমি এপারের সব,
সপ্তনদী অতিক্রান্ত করে গেলে।
কেবল তাকে আমি
ভালবাসতে চাই।
তোমার শীতল স্নিগ্ধ ধারা
চন্দ্রালোকের বর্ণচ্ছটায়
কোয়েল নদীর ধার ঘেঁসে
গভীর আরণ্যকে আমার খেলো হারিয়ে।
চোখ বুঁজে প্রার্থনা করি,
শিশিরস্নাত হয়ে রেণু ঝরিয়ে পল্লব
আনমনের মরমী তীরে।
পূবালী হাওয়ায় তোমার অনন্তত্ব
বিলীয়মান থাক্ অজানায়।

□

অন্ধকারে যখন

কল্যাণব্রতী মিত্র

বড়ো রাতে অন্ধকারে
যখন তোমার চোখ
মোমবাতির আবছা আলোয়
আঁশিতে মুখ দেখা।
যেন কোনো অস্পষ্ট দিন
কবেকার কোন কুয়াশার
আবছা আলোর সকাল।
যেন কোনো ছবির রঙে
অন্যমনস্কতায় রঙ মিটোনো
অনভ্যস্ত হাতে।
বড়ো রাতে বাদলা হাওয়া
মুখের ওপর
তোমার মন তখন
মোমবাতির আলোর অন্ধকারে।

□

তবুও আমরা

কমল কুমার রায়

পাশের বাড়ীতে আজও অর কানে
রাস্তার স্রোতের ভিতর,
হিসাব না করা উদ্বৃত্তটুকুর
এমনি করেই হয় প্রাত্যহিক সদ্গতি।
পথচারী অভুক্ত পথিকের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় সেদিকে
তাদের হৃদয়ে শুরু হয় আকস্মিক অস্থিরতা,
বিক্ষত হয়েই ফিরে চলে ওরা।
বড় বাড়িটার সবুজ আলোয় ভালবাসার ভীড়
এদিক ওদিক উড়ন্ত প্রজাপতি
সভ্যতার ধারক হতে গিয়ে জীবনস্রোতে ভেসে গেল।
ফুটপাতে ভূমিষ্ঠ হওয়া সদ্যোজাত শিশুটি
মাতৃস্তনে দুধের অভাবে
কাঁদতে কাঁদতে নীলাভ হয়ে
জীবনস্রোতে ভেসে গেল।
কালের আবর্তন কত মধুময়।
আধুনিক সভ্যতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে
ছোট বড় আমরা সবাই
জীবনস্রোতে ভেসে যাচ্ছি,
তবুও আমাদের শুভবুদ্ধিকে আমরা
মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবো না।

□

With best compliments from :

PHONE : 65-8036

SRI HARADHAN PAUL

22 HASNA BIBI LANE, P. O. SALKIA
DIST. HOWRAH

PIN-711 106

□ গল্প □

ঢেউয়ের পরে ঢেউ

অর্ধেন্দু বিশ্বাস

ব্যাপারটা এখন মনে পড়লে খুব অবাক লাগে। সেপ্টেম্বর মাসের সাতাশ তারিখটা যত এগিয়ে আসে ততই আমার মনটা খারাপ, ভীষণ খারাপ করতে থাকে। ঐ তারিখটা ছিল আমার চাকুরীতে যোগদানের দিন। চাকুরীতে যোগ দিলে এমন কিছু সাফল্য তো আসে করে আসতে হবে, যা ওই তরুণ বয়সে আমার অসহ্য মনে হয়েছিল।

অথচ দিনে চাকুরী নিয়ে রাতে অনার্সসহ বি. এ. পড়ব বলেই ভর্তি করে একদিন দূর গ্রাম থেকে কলকাতা চলে এসেছিলাম।

আমার মনোমত বিষয়ে অনার্স থাকলে আমি বহরমপুরের কলেজেই পড়তাম; কিন্তু তা না হওয়াতেই কলকাতায় আসার ঝুঁকি নিতে হয়েছিল আমাকে।

কিন্তু অনার্স পড়াই বা কেন, আর তার জন্য কলকাতা আসারইবা দরকার কি ছিল?

এ কথার উত্তর দিতে গিয়ে স্কুলের নীচু শ্রেণীতে পাঠরত অভিজ্ঞতাহীন একটি সরল মনের কল্পনাবিলাসী বালকের কথা মনে পড়ে যায়। ওই বয়সেই সে বই পড়তে খুব ভালোবাসত—গল্প, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী, ইতিহাস, ফুটবল, এমন কি ছোট খাটো অঙ্ক—কিছুই বাদ পড়ত না তার পোড়াসী অধ্যয়নের কবল থেকে। বয়স কি এগারো বছর তার বয়স; কিন্তু কল্পনার মিশেলে বুদ্ধিবৃত্তিতে তখন সে অনেক এগিয়ে। পাশের বাড়ির দাদুর কাছ থেকে নিয়ে নিয়মিত সে সাপ্তাহিক বসুমতী পড়ে, আর মায়ের কাছ থেকে কেঁদে ককিয়ে পয়সা আদায় করে নিয়ে সে মনিঅর্ডার করে পাঠায় 'খোকাখুকু' 'শুকতারা' 'শিশুসাথী'র দপ্তরে। সুতরাং তার পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে এইসব পত্রপত্রিকার জোর প্রতিযোগিতা চলে এবং দুই পক্ষের কেউই হার স্বীকার করে না, দুই পক্ষই তরতর করে এগিয়ে চলে অর্থাৎ ক্লাসের পরীক্ষায় যেমন হত, তেমনি সে প্রথমই হতে থাকে আর তার পড়ার ঘরে পাঠ্য বইকে ছাড়িয়ে অপাঠ্য বইয়ের সংখ্যাধিক্য ঘটতে থাকে। এরই মধ্যে সখের মিল দিয়ে সে একটা চলমান পদ্য লিখে ফেলল। তার লেখা এই পদ্য পড়ে তার বিবেচক অভিভাবকেরা তাকে শাসন করবার পরিবর্তে তার উৎসাহবর্ধন করলেন এবং শিক্ষকেরা হীতিমত হর্ষের সঙ্গে তাকে কবি নামে সম্বোধিত করলেন। ফলে ক্লাসের পড়াশুনার ফাঁকে-ফোঁকরে তার অনিয়মিত পদ্য লেখার অভ্যাসটি আষ্টে পিষ্টে নিয়মের নিগড়ে বাঁধা পড়ল আর অঙ্ক, ইংরাজী, ইতিহাস, ফুটবলের খাতার সঙ্গে অবস্থান করেই পদ্যের খাতাখানি সবচেয়ে বেশী স্ফীত হয়ে উঠতে লাগল।

তারপর একদিন তার মনে বাসনা জাগল, প্রবল বাসনা—তাকে কবিই হতে হবে, এবং কবি হতে হলে কল্পলোকের বাসভূমি, সবপেয়েছির দেশ কলকাতাতে যেতেই হবে। ঐটুকু বয়সেই সে কলকাতাকে চিনতে পেরেছিল আর তার সঙ্গে অনুভব করেছিল তীব্র নাড়ির টান।

তারপর কলকাতার প্রতি সমান মোহ নিয়েই একদিন সে পেরোল স্কুলের বরজা, পড়তে এল বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে। শতবর্ষের আলোয় তখন ঝলমল করছে এই কলেজ।

সপ্তবার্ষিক উৎসব চলল সেখানে বারোটি মাস ধরে। এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবেই এই কলেজের প্রাঙ্গণে বসলো এমন দুটি জাঁকালো সভা, যা তার কবিজনকে উত্তেজিত করল অকল্পনীয় ভাবে। একটি কবিসভা; অন্যটি সাহিত্যসভা। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিকেরা এলেন, তাঁদের নিজেদের রচনা পড়লেন, আর আলোচনা করলেন কাব্য ও সাহিত্য সম্পর্কে, আলোচনায় বিদেশী সাহিত্যও বাদ পড়ল না।

কবি-সাহিত্যিকদের সে খুব কাছে থেকে দেখল, তাঁদের অটোগ্রাফ নিল আর শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সব ভরে ভরে নিল সাহিত্যের বিশুদ্ধ বাতাস। কবি হবার পথে এক পা সে এগিয়ে গেল। কলেজের কবিতারচনা-প্রতিযোগিতায় সে হল প্রথম, কলেজ পত্রিকায় ছাপা হল সেই কবিতা আর তার লাজুক মুখের ছবি।

কলকাতা, কলকাতা—এর পর তার চিন্তা-ভাবনা-ধ্যান-জ্ঞান জুড়ে রইল কলকাতা। কলকাতা তাকে যেতেই হবে; ওইখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে কবিখ্যাতি, ওখানকার পত্র-পত্রিকা যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছে কতদিন ধরে।

তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় কলকাতার এক বিখ্যাত শিশু মাসিক পত্রিকায়; তখন সে স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র। এই অলৌকিক ঘটনাটি সাময়িকভাবে তাকে আনন্দে আবেগে একাকার করে দিল, আর তার কবি হবার আজন্ম বাসনাকে একেবারে চরমভাবে উস্কীপিত করে তুলল। তখনই সে মনে মনে সংকল্প নেয়, কলকাতায় তাকে যেতেই হবে, সেখানে না গেলে তার কবি হওয়া হবেনা। ওই বয়সেই তার ধারণা হয়েছিল, কলকাতা শিল্প-সাহিত্য সঙ্গীতের তীর্থক্ষেত্র।

স্কুলফাইন্যাল পাসের পর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে অতঃপর ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীর পাঠগ্রহণ।

পরীক্ষার ঠিক ছয় মাস আগে তার জীবনে এমন একটা দাঙ্গা-কেটে যাওয়া ঘটনা ঘটল যা তার কবি হবার বাসনাটিকে আর এক মাত্রা বাড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু পরীক্ষা দেবার মানসিকতাকে দিল প্রচণ্ডভাবে এলোমেলো করে। সেবার আর তার পরীক্ষা দেওয়াই হল না।

স্কুলের শেষ দুই ক্লাস পড়েছিল সে তার এক ঘনিষ্ট আত্মীয়ের বাড়ী থেকে। শেষ ক্লাসের একেবারে প্রথমদিকে সেই বাড়ীতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এল তাদের দুই আত্মীয়কন্যা। পিঠেপিঠি দুই বোন; বয়সে একজন প্রায় তারই সমান, আর একজন বছর দুয়েকের ছোট। ওরা এই বালককবির কবিখ্যাতি আগে থেকেই শুনেছিল, আর এখন সেই কবিকে দেখে তাদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। কবির প্রতি ওদের এত বেশী আগ্রহ দেখে কবি নিজেও কম কৃতার্থ হল না। অচিরেই তারা তিনজন সহমর্মিতায় বাঁধা পড়ল এবং কবির কবিতা সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতেও যেমন থাকল, তেমনি কবিতাগুলি দুই বোনের, বিশেষ করে অগ্রজার কণ্ঠে শ্রুত হতেও মোটেই সময় লাগল না। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই অগ্রজা হয়ে উঠল কবির কবিতার ভাণ্ডারী। বাড়ীর সামনে ছিল যত্নে বাহাল করা চমৎকার এক স্কুলের বাগান, তাতে পরিচিত সব স্কুলের গাছই ছিল। বাইরের ঘর থেকে একটা ছোট সিঁড়িপথ নেমে গেছে সেই বাগানে। বিকেলবেলায় সেই সিঁড়ির শেষ ধাপটিতে বসে সে ক্লাসের পড়া পড়তে ভালোবাসত। আর ঠিক সেই সময়টাতে জলভর্তি কলসী কাঁখে নিয়ে স্কুলের গাছে জলসিঞ্চন করতে আসত অগ্রজা। তার কাজ শেষ হলে কলসীটা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে সে তারপর একটা গোলাপ গাছের প্রস্ফুটিত গোলাপের পাপড়িগুলো নাড়তে নাড়তে কবির সদ্যোরচিত কবিতাগুলি তার বাঁশীর সুরের মত কণ্ঠস্বরে

পরপর আবৃত্তি করে যেত। চরম আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় কবি তখন অঙ্কের বই থেকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আবৃত্তিকারিনীর নিখুঁত কর্মঃ মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকত আর বারবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করত, আমাকে কবি হতেই হবে। সেও কবিকে আরও বড় কবি হবার অনুরোধ জানিয়ে কলসীটি তুলে নিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে যেত। কবি তখন সেখানে বসে থাকত আনমনা হয়ে আর তার কানে তখনও বাজতে থাকত আবৃত্তির সুরের মিষ্টি রেশ, আর গদগদ হয়ে ভাবত, এই তো রচিত হয়ে গেল একটা সুন্দর মধুর কবিতা।

পরীক্ষার ঠিক ছয় মাস আগে সেই মেয়ে লিখল একটা ছোট্ট চিঠি, 'তুমি পরে শুনলেও, কর্তব্য বোধে তোমাকে আমি আগেই জানিয়ে দিই, মা-বাবার ইচ্ছেতে আগামী মাসের সাত তারিখে আমার বিয়ে। এ বিষয়ে কোনো কিছু ভাবার তোমার প্রয়োজন নেই। তুমি খুব ভালোভাবে পড়াশুনা কর এবং কবি হবার স্বপ্নকে সার্থক করে তোল ; তবেই আমার সান্ত্বনা।'

সত্যিই তার ভাবনার কিছু ছিল না, পড়াশুনার প্রস্তুতিও যথেষ্ট ভালো হয়েছিল। কিন্তু যতই তার পরীক্ষার আর ওর বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে লাগল, ততই একটা দুর্বলতা তাকে পেয়ে বসতে শুরু করল। সে যতই ভাবে, সে ওর বিয়েতেও যাবে আবার পরীক্ষাও দেবে, ততই তার কাছে ওই দুটো বিষয়ই অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং শেষে অবাঞ্ছিত হয়ে উঠল। আর সেই কারণেই তার মন রাগ, বিদ্বেষ, বিদ্রোহ—সব পড়ল গিয়ে ওই পরীক্ষাটির উপর। পরীক্ষা সে দিতে পারল না। পরবর্তী দুটি মাস বাড়ীতে বসেই অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে দিল সে।

মনটা খানিকটা শান্ত হলে মায়ের নির্দেশে আবার শহরে এল সে পড়াশুনা করতে ; পরের বছরে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা দেওয়ার জন্য সতর্ক হয়ে রইল সে।

এবার সে থাকবার জায়গা বদলাল। বহরমপুরের একেবারে উত্তরভাগে মুরগাটার একটা নির্জন বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা হল তার দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়-পুত্রের সঙ্গে। সেও পড়ত ওই কৃষ্ণনাথ কলেজেই বিজ্ঞান শ্রেণীতে এবং তার সঙ্গে কলেজে প্রায় প্রতিদিনই তার দেখা হত। তার নাম হিরণ। এই বাড়ীটা আসলে হিরণের পিসতুতো দাদা শঙ্কর ভৌমিকের। শঙ্করবাবু অবিবাহিত এবং তিনি কলকাতার একটা সরকারী অফিসে চাকুরী করতেন। এক একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নিয়ে প্রতি শনিবার রাত্রে তিনি এখানে আসতেন এবং সোমবারের ভোরের ট্রেনে কলকাতা ফিরে গিয়ে অফিস করতেন। এই বন্ধুদের মধ্যে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের নাম রতন চক্রবর্তী। কলকাতার চাকুরিয়াতে শঙ্কর ভৌমিকের আর একটা বাড়ী ; শেয়ালদার কাছে বৌবাজার স্ট্রীটে তাঁর একটা বাসাও ছিল। এই দেবোপম ব্যক্তিটির সদ্‌গুণের সীমা নেই। তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রতই ছিল—দরিদ্র ও মেধাবী ছেলেদের নিয়ে এসে তিনি তাঁর বাড়ী ও বাসাতে আশ্রয় দিতেন এবং সর্বপ্রকারে তাদের পড়াশুনার সাহায্য করতেন। তাঁর এই আন্তরিক সাহায্য লাভ করে বহু ছেলে অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র, বড় অফিসার হয়ে জীবনকে সার্থক করে তুলেছে। পরেও এদের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কের কোন বিচ্ছেদ ঘটেনি। এঁর কথা স্বতন্ত্রভাবে অন্য কোনও সময় অবশ্যই বলা যাবে, এবং রতন চক্রবর্তীর কথাও।

এই শঙ্করবাবু প্রথম দর্শনেই তাকে ভালোবেসে ফেলেন এবং ইন্টারমিডিয়েটের পর কলকাতা গিয়ে পড়াশুনা করবার বিষয়ে তাকে উৎসাহ ও প্রেরণাই শুধু দেন না, প্রয়োজন হলে তার সমস্ত

দায়িত্ব নিয়ে তাকে তার উচ্ছেশ্যত পড়াশুনার সুযোগ করে দেবার জন্য অহৈতুকী প্রতিশ্রুতিও দেন। একটা অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার সূত্র ধরে শঙ্করবাবুকে সে ডাকে মামা বলে।

একটা সঙ্কটময় অবস্থার মধ্য দিয়ে তার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হলে, অল্পদিন পরেই শঙ্করবাবু তাকে কলকাতায় নিয়ে যান। তাঁদের চাকুরিয়ার বাড়ীতে থাকতে থাকতেই কয়েক-দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফল বেরোয় এবং কোনো কিছু না ভেবেই বঙ্গবাসী কলেজে সে বাংলা অনার্স নিয়ে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে যায়।

ক্লাস শুরু হবার আগে কয়েকদিন বাড়ীতে ঘুরে আসতে গিয়ে তার মনে পড়ে, কলকাতায় সে থাকবে কোথায়। এই মুহূর্তে শঙ্করমামার চাকুরিয়ার বাড়ীতে থাকার অসুবিধা আছে। কলকাতায় আর কোথাও থাকার ব্যবস্থা হবে কি না শঙ্করমামা তারও কোনো আভাস দেননি। তাহলে? তখন মনে তার সাহস আসে এই ভেবে যে, শঙ্করমামা তো আছেন, আমাকে কিছু না বললেও নিশ্চয়ই তিনি একটা ব্যবস্থা ঠিকই করে রেখেছেন।

ক্লাস শুরু হবার দুদিন আগে বাড়ী থেকে সরাসরি চাকুরিয়াতেই এলাম। শঙ্করমামা বললেন, এ বাড়ীতে আগামী কাল থেকে কেউ থাকছে না, আর বৌবাজারের বাসাতেও থাকার আর জায়গা নেই। তাই তোমার থাকবার ব্যবস্থা করেছি আমার মেজদির বাড়ী পাইরাডাঙাতে, চল, আগামী কালই তোমাকে ওখানে রেখে আসি। আপাতত কিছুদিন ওখান থেকেই ক্লাস কর, পরে কলকাতায় একটা ব্যবস্থা করছি।

সুতরাং পাইরাডাঙা থেকেই ক্লাস করতে শুরু করলাম। একেবারে রেল স্টেশনের পাশেই শঙ্করমামার মেজদির বাড়ী, ট্রেনে ওখান থেকে শেয়ালদা আসতে লাগে দুঘন্টা। শঙ্করমামার মেজদি অর্থাৎ মামীমা অত্যন্ত যত্নে আমাকে গ্রহণ করলেন। সময়ের বিষয়টা ছাড়া ওখান থেকে ক্লাস করতে আমার কোনই অসুবিধা হল না। সকাল আটটায় শান্তিপুর লোকাল ধরে আমি সওয়া দশটা নাগাদ শেয়ালদা পৌঁছাই, সাড়ে দশটায় আমার ক্লাস শুরু। স্টেশনের সামনে আপার সারকুলার রোড (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) পার হয়েই বৈঠকখানা রোডে বঙ্গবাসী কলেজ, স্টেশন থেকে তিন-চার মিনিটের পথ। যত দূর মনে পড়ে আমার ক্লাস শুরু হয়েছিল জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহের কোনও একটা দিন।

কয়েকদিন মাতাপিতার পরেই ত্রৈমাসিক আনন্দে, আমার মনটা ভরে উঠল। নতুন পরিবেশে পাইরাডাঙায় মামীমার স্নেহচ্ছায়ায় বাস করা, দুঘন্টা রেলপথে ভ্রমণ করার মাধুর্য উপভোগ এবং কলেজে অনার্স ক্লাস করার উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা—আমার জীবনটাকে একেবারে পরিপূর্ণ করে তুলল।

এখান থেকে আমি দু'মাস ক্লাস করেছিলাম। এই দু'মাসের মধ্যে ক্লাসের সহপাঠি সহপাঠিদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল যে, তাদের সঙ্গ যে কোনদিন বিচ্ছিন্ন হবে, সে কথা ভাবতেই পারিনি। তাছাড়া পাইরাডাঙার পরিবেশও ছিল এক কথায় মনোমুগ্ধকর। এই দু'মাসের মধ্যেই এই বাড়ীর ছোটো-বড় সকলের কাছেই শঙ্করমামীর বদ্ধনে বাঁধা পড়ে গেলাম। সব মিলিয়ে আমি যা চেয়েছিলাম, পেয়ে গেলাম তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী।

পথের আনন্দের কথাই যদি ধরা যায়, তাহলে সেটাই কি কম। মাসিক-টিকিট করে নিয়েছিলাম—ভাড়া যতদূর মনে হয় ১৪ টাকা কয়েক আনা যেন। কলেজ থেকে ফেরার সময়

প্রায় প্রত্যেক দিনই রবিবারের কোন একটা স্টেশনে নেমে গিয়ে তার আশেপাশের গ্রামগুলো দেখে বেড়াতাম। এইভাবে বেড়াবার সূত্রে কত গ্রাম-জনপদই যে চেনা জানা হয়ে গিয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে শুধু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই স্থাপিত হল না, কাব্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা, পরস্পরের লেখা পড়া, সংশোধন করা, ছুটিছাটায় এখানে সেখানে বেড়াতে যাওয়া—তরুণ জীবনে এর চাইতে বড় পাওনা আর কি হতে পারে। এক কথায় কানায় কানায় পূর্ণ আনন্দ নিয়ে আমার কলকাতার ছাত্রজীবন কাটতে লাগল।

ঠিক এমনি সময়ে আমার একটা চাকুরী হয়ে গেল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন বিভাগের কনস্ট্রাকশন বোর্ডের প্রধান বাস্তুকারের অফিসে। তখনকার কলকাতার উচ্চতম অট্টালিকা 'নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংএর ষষ্ঠতলায় সেই অফিস। চাকুরীর পদটি আহামরি এমন কিছু নয়, দপ্তরীর পদ, বেতন সাতষট্টি টাকা। যোগদানের তারিখ আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর।

নিয়োগপত্রটি হাতে পাবার পর যেন এক ফুঁয়ে ভরে গেল আমার সব আনন্দ, সব চঞ্চলতা।

এই দুই-আড়াই মাসে আমার যে ত্রিমাসিক আনন্দের ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল, চাকুরীতে যোগ দিলে তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, সেকথা ভেবেই আমি ভীষণভাবে মুষড়ে পড়লাম।

চাকুরীর ইতিহাসটা সংক্ষেপে এই : কলকাতায় থেকে পড়াশুনার খরচ চালানোর ক্ষমতা আমার মায়ের ছিল না। জমি-জায়গা যা ছিল আমাদের, তার আয়ে আমার পড়াশুনা যেন ভালোভাবেই চলে যেত। কিন্তু আমি খুব অল্প বয়সে পিতৃহারা হয়েছিলাম বলে, সেই সব দেখার কেউ ছিল না। সহৃদয় আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের দেখাশুনা করতেন, তবে তাতে গ্রামজীবনের যথাকর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে আমাদের ভরণপোষণটা চলে যেত, এইমাত্র। এর বাইরে খরচ করবার মত অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান হত না। এই কারণে উচ্চশিক্ষা নিতে হলে, আমার নিজের রোজগার করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। এ বিষয়ে মহকুমার সঙ্গে আমার কথাও হয়েছিল। ফলে কলকাতায় আসবার প্রথম পর্বেই মহকুমার চেষ্টাতেই তাঁদের অফিসে একটা দপ্তরী পদের জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে রেখেছিলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন বিভাগের অধীন কনস্ট্রাকশন বোর্ডের প্রধান বাস্তুকারের অফিসে এই চাকুরী। সেখান থেকেই আমি নিয়োগপত্র পেলাম।

কলেজে ভর্তি হবার এবং পাইরোডাঙা থেকে কলেজের ক্লাস করার পর থেকে আনন্দের ত্রিধারায় ডুবে গিয়ে আমি এইসব একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।

মাসীমার বাড়ীতে এমন একটা চমৎকার পরিবেশ ছিল, যা আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। তাঁর স্নেহধারার সৌকর্যে আনন্দে-কৃতজ্ঞতায় আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল এই বাড়ির আট-দশ বছরের ছোট্ট মেয়েটি। ওকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া আমার পক্ষে ছিল একান্তই মর্মান্তিক ঘটনা। এই আমার প্রথম আনন্দ। পাইরোডাঙা থেকে কলকাতা—এই দীর্ঘপথের রেলযাত্রার বৈচিত্র্য ছিল আমার দ্বিতীয় আনন্দ। তৃতীয় আনন্দ ছিল আমার ক্লাসের বন্ধুরা। বুদ্ধিমান, রসজ্ঞ ও ভালবাসার ঐশ্বর্যে ভরা আমার এইসব সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী বন্ধুরা ছিল আমার হৃদয়ের আলোর পথের দিশারী।

চাকুরীতে যোগ দিলে আমাকে আমার এই ত্রিধারার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। চাকুরী করতে হলে থাকতে হবে কলকাতাতে এবং কলেজের 'ত্রিধারিভাগ' থেকে চলে আসতে হবে 'নৈশবিভাগ'-এ। তাই এই চাকুরীটি মেনে নিতে পারছিলাম না।

শঙ্করমামার সঙ্গে আলোচনা করে এবং বাস্তব পরিস্থিতির কথা ভেবে আমার আঠাশ মাসের সঞ্চিত সব আনন্দকে পেছনে ফেলে অনিচ্ছাকে হাতের তালুতে চেপে রেখে একদিন যোগ দিলাম চাকুরীতে, বদলী হলাম নিউ-সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর ঘর্তলের কাচরের একটা ঘরে।

ইন্টারমিডিয়েটে পড়েছিলাম হাফ-শার্ট হাফপ্যান্ট পরে। মহারাজা কলেজে ক্লাস করতাম শার্ট-পায়জামা পরে। শঙ্করমামা বললেন, অফিসে যেতে হবে ধুতি-শার্ট পরে। তখনও তরুণদের ফুলপ্যান্ট-চাওয়াই-শার্টের চলন হয়নি।

২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ঠিক দশটায় ধুতি-শার্ট পরে শঙ্করমামার সঙ্গে কনস্ট্রাক্টিভ বোর্ডের অফিসে গিয়ে ভারাক্রান্ত মনে যোগ দিলাম কাজে।

প্রধান করণিক হৃষিকেশ মিত্র আমাকে কাছে ডাকলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে নিজের মনেই তিনি উচ্চারণ করলেন, দেখছি, একেবারে বাচ্চা। তারপর আমাকে পাশের চেয়ারে বসতে বলে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি চেয়ারে বসে লাজুক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আমার নাম বললাম।

তুমি বাংলায় অনার্স নিয়ে কলেজে পড়? তিনি সহাস্যমুখে বললেন, চাকুরীতে যোগ দিলে, এখন কি করবে?

আমি উত্তর দিলাম, পড়ব। তারপর একটু থেমে বললাম, আমাদের কলেজে রাত্রেও ক্লাস হয়; আমি এখন সেখানে রাত্রেই ক্লাস করব

এভাবে তোমার অসুবিধা হবে না? তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন।

অসুবিধা হবেই, আমি বললাম, চাকুরী করে আমাকে পড়তে হবে বলেই তো আমি কলকাতা এসেছি।

বাঃ, চমৎকার। তিনি বললেন, খুব খুশী হলাম তোমার কথায়। নিশ্চয়ই তোমার পড়াশুনা হবে। তারপর তিনি একজন ভদ্রমহিলাকে ডেকে বললেন, সেফালি, একে তোমার কাছে নিয়ে গিয়ে কাজ শিখিয়ে দাও। দপ্তরীর কাজ নয়, ওকে রিসিভিং ক্লার্কদের কাজ দিও। এতে কাজও হাল্কা থাকবে, আর ও পড়াশুনাও করতে পারবে মাঝে মধ্যে।

সেফালী দাশগুপ্তা। এখন সত্তরঃ মহিলা খুব কম আছে। দুই-তিন দিন ধরে অতীব যত্নের সঙ্গে তিনি কাজ শেখালেন আমাকে। তাইয়ের থেকে শিক্ষ হয়ে তার কাছে কাজ বুঝে নিলাম আমি।

কলেজে আমার ক্লাস নৈমিত্তিকভাবে পরিবর্তন করে নিলাম। থাকার ব্যবস্থা হল কলেজ থেকে শ' দুয়েক মিটার দক্ষিণে বৌবাজার স্ট্রীটের উপর 'কোলে বিল্ডিং' নামের এক বৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতলের একটা ঘরে। এই ঘরটাই শঙ্করমামার ভাড়া-নেওয়া ঘর। এখানে আর একজন ছাত্রকে নিয়ে শঙ্করমামা থাকতেন। সেই ছাত্রটির তখন পড়াশুনার পাঠ শেষ হয়ে যাওয়াতেই সেখানে আমার স্থান হল।

রাত্রের ক্লাসে কিছুদিন কাটল আমার আচ্ছন্ন ভাবে। তারপর একে একে পরিচয় ঘটতে লাগল ক্লাসের অপরাপর ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই আমার মত দিনের বেলায় চাকুরী করত, অনেকে কোথাও না কোথাও, শিক্ষকতা করত স্কুলে। দিবাবিভাগের বন্ধুদের স্মৃতিতে

মন ভরে থাকলেও ধীরে ধীরে এদের সঙ্গেও মিশতে লাগলাম এবং একদিন এরাই আমার একেবারে কাছের মানুষ হয়ে উঠল।

অফিসে যেখানে বসতাম আমি ঠিক তার পেছনে বসতেন যে টাইপিস্ট মহিলাটি তাঁর নাম ইরা ঘোষ। বয়সে তিনি আমার চেয়ে তিন-চার বছরের বড় ছিলেন। তিন-চার দিনের মধ্যেই তিনি আমাকে তাঁর ভাইবোনের স্নেহে ভালোবেসে ফেললেন। এই অফিসে আমার সমবয়সী কেউ ছিল না, আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। ফলে এই অফিসের নারী-পুরুষ সকলের ভালোবাসা পেতে আমার দেরী হল না। প্রায়ই ইরা ঘোষ তো বটেই, অন্যান্য মেয়েরাও ভাগাভাগি করে আমার কাজ করে দিতেন, আর সেই সুযোগে ঘরের কোণে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে আমি আমার ক্লাসের পড়া পড়তাম।

বিকেল পাঁচটায় অফিসের ছুটি হলেই, লিফ্‌ট থেকে নেমেই এক অদ্ভুত আবেগে ছুটতাম কলেজে। আমাদের ক্লাস শুরু হত সন্ধ্যা ছটায়, শেষ হত রাত্রি নটায়। ক্লাসের শেষে ক্লাস করার নিয়ে কলেজের সামনের 'চোরাবাজারে'র মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়ে 'কোলে বিল্ডিং'-এর দোতলার ছোট্ট ঘরটিতে গিয়ে ঢুকতাম। কোনো কোনো দিন রাস্তার দোকান থেকে আট আনার আটখানা রুটি আর তরকারী কিনে নিয়ে যেতাম। তাতেই সন্ধ্যবেলায় আর আমার রাত্রির খাবার হয়ে যেত।

এমনি করে ধীরে ধীরে—'কোলে বিল্ডিং'-এর বাসা, অফিস আর সেখান থেকে কলেজ—এই ত্রৈরাশিক অবস্থানের মধ্য দিয়ে আমি আমার কলকাতার জীবনকে সহজে নিলাম।

তারপর পুজোর পর একদিন উষারাণি আমাকে নিয়ে গেলেন তাদের বাড়ী এন্টালিতে। বাড়ীতে আছেন তাঁর বিধবা মা আর তাঁর ছোট তিন বোন। তাঁর বছর পাঁচেকের ছোট বোন অনুশীলা পড়ে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে, তার দুবছরের ছোট বোন তৃষ্ণা পড়ে নবম শ্রেণীতে। সর্বকনিষ্ঠ বোনটির বয়স হবে বছর দশেক, নাম অনন্যা; পড়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে।

ছোটখাট্টো চেহারার ফুটফুটে কর্মা উষারাণির মায়ের সুন্দর মুখখানি স্নেহরসে মাখানো। প্রণাম করতেই তিনি আমার চিবুক ধরে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর আমি সুস্থির হয়ে দাঁড়াতেই একে একে আমাকে প্রণাম করল—অনুশীলা, তৃষ্ণা আর অনন্যা। আমার মনে হল এরা চার বোন যেন একগুচ্ছ চাঁপা ফুল।

আমি অনন্যাকে কাছে টেনে নিয়ে তার রেশমের মত চুলের মধ্যে বাঁ হাতের আঙুলগুলি ডুবিয়ে ডান হাত দিয়ে তার মুখখানি তুলে ধরে বললাম, তুমি আমার সাত সাগর আর তের নদীর পারের ছোট্ট পারুল বোনটি।

আর তুমি? তুমি আমার পক্ষীরাজ ঘোড়ার চড়ে উড়ে আসা কুড়িয়ে পাওয়া দাদাভাই। এই বলে অনন্যা খিল খিল করে হেসে উঠল।

তার এই নিষ্কলুষ অনাবিল হাসির স্পর্শে আমার মনটা কেমন করে উঠল, আমার মনে হল, আমি অনেক কিছু হারিয়েছি ঠিকই, কিন্তু এই মুহূর্তে যা পেলাম, তা আমার সব হারানোকে ছাপিয়ে গেল। তখন মনে পড়ল, কবি হবার জন্যই আমি কলকাতায় এসেছি।

তারপর অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতা আমার একান্ত আপন হয়ে উঠল।

□

□ গল্প □

ক্যালেণ্ডার

সত্যেন্দ্র আচার্য

তখন অক্টোবরের শেষ কি নভেম্বরের প্রথম দিক। বছরের ঠিক এই সময়, পুজো-শেষের এই কটা মাস শহরে ম্যাজিকটা ঠিক জমে ওঠে না, ঘরটা জমে থিয়েটার আর জলসার ঘরোয়া। তাই প্রতি বছরই আমি এ সময়টা বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

এইটুকু বলেই যাদুকর থামলেন। বললেন, দেখুন ঘটনাটি আপনি যাকে খুশি বলতে পারেন, কিন্তু আমার নামটার জন্য আপনাকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। কথা দিন, ঘটনাটি বললেও আমার নামটা আপনি কখনো প্রকাশ করবেন না?

আমি কথা দিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, ঠিক এই সময় মিঃ পালিত একদিন টেলিফোনে বললেন, কি ম্যাজিসিয়ান, একটা জায়গায় ঘুরে আসবেন?

এমনি অপ্রত্যাশিত এই আহ্বানের জন্য মিঃ পালিতকে টেলিফোনে অজস্র ধন্যবাদ জানালাম। মিঃ পালিত বললেন, কিচ্ছুটি ভাববেন না, সব ব্যবস্থা আমি পাকা করে রাখব। তাছাড়া জায়গাটা যে অতীব মনোরম, আশা করি তা আপনি অস্বীকার করবেন না।

হ্যাঁ, তবে আমি ভগ্নস্বাস্থ্য নই। তাছাড়া স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে অযথা সময় কাটাবার মত প্রচুর অবকাশ এখন আমার নেই। যাদুকরেরা এ সময় অন্তর্বিত্তর সময়টাকে কাজে লাগান, নতুন নতুন খেলাগুলোকে এই সময় তৈরি করেন। সেই জাপানী যাদুকর যে একটি অভাবনীয় খেলা দেখিয়ে-ছিলেন, সেটা নিয়েও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে আমার। ভদ্রলোক শরীর থেকে একটা হাত বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। কিন্তু আমি কি চাই জানেন?

কী একটা উত্তেজনায় যাদুকরের চোখ দুটো কেমন বিস্ফোরিত হল। বললেন, আমি চাই, আমার জীবনের শেষ খেলা হবে সেইটা। মানুষের আত্মা নিয়ে আমি অনেক খেলাই খেলেছি। ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আমার মিডিয়ামকে মৃত বলে দর্শকদের সামনে ঘোষণা করিয়েছি, তারপর সেই মিডিয়ামের কিডনী টেনে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছি, পরক্ষণেই আবার তাকে সুস্থ মানুষে পরিণত করেছি। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ডাক্তারী বিদ্যাকে উপহাস করেছে আমার যাদুবিদ্যা।

থামলেন যাদুকর। বেশ কিছুক্ষণ থেমে থেকে বললেন, দেখুন, আত্মা নিয়ে আমি অনেক খেলাই খেলেছি। শুধু কি জানেন? আজও আমি ভাবতে পারি না কেমন করে আমার চোখের ওপর সমস্ত ঘটনাটা সেদিন ঘটে গেল।

আবার চুপ করলেন যাদুকর। বললেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম…

সারা রাত্রি ট্রেনে কাটিয়ে আমরা পাঁচজন দুপুরের দিকে বারলোয় গিয়ে পৌঁছলাম। ইতিমধ্যে চিঠি লিখে সব ঠিক করে রেখেছিলেন মিঃ পালিত। আমাদের প্রতীক্ষায় ভেওয়ারী যেন পথ চেয়ে বসেছিল। রাজকীয় অভ্যর্থনায় স্টেশন থেকে আমাদের বারলোয় নিয়ে এল।

জায়গাটা আগে ছিল রেল-কলোনি। আগে, বহু আগে। সেই প্রথম যখন রেল ফলকের পত্তন হ'ল এদেশে। ওই জায়গাটায় একটা ছোট্ট কারখানাও নাকি তৈরি করেছিল সাহেবরা। অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে এসে আজ তার চিহ্নমাত্র নেই, এখন শুধু ইতিউতি ছিটিয়ে কয়েকটা লোহিন বাড়ি আর ওই বারলোটা। দূরে পাহাড়। ঝরণা থেকে নেমে একটা নদী উত্তরে বাঁক নিয়ে পশ্চিমে চলে গেছে। আর কবরখানা। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আজো বেঁচে আছে সেইসব সাহেবরা, আর বেঁচে আছে তাদের অত্যাচারের একটি-দুটি দৃষ্টান্ত। নাকি যতবার রেল বসায়, ততবার মারা বেঁচে। ওয়ার্কস ম্যানেজার একজন সাহেব নাকি স্বপ্ন দেখে, নিষ্পাপ যুবতীর রক্ত ছিটোও রেল ফলকে। শেষ পর্যন্ত সাহেবরা নাকি তাই করেছিলেন। উত্তর ভারতের এ জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে সেই অসহায় নিষ্পাপ যুবতীর তীব্র চীৎকার আজ আপনি শুনতে পাবেন না, কিন্তু ইতিহাসের পাতা খুললেই সে চীৎকার আপনি শুনতে পাবেন।

ঐতিহাসিক তাৎপর্যে শুধুমাত্র সে জায়গাটা পর্যটকদের চোখে কোহিনুর তা নয়, মায়াকরও বটে। তাই জায়গাটা ঘুরে আসার লোভে আমি সামলাতে পারিনি।

সন্ধ্যার দিকে ভেওয়ারী বলল, শোবার কি ব্যবস্থা হবে বাবুসাব?

কেন? ঘরের তো অভাব নেই, কিন্তু নিরিবিলি ওই কোণের ঘরটা আমার জন্য খুলে দিও ভেওয়ারী।

কোণের ঘর?

হ্যাঁ।

চমকে উঠল ভেওয়ারী। বলল, সে কি, ওখানে থাকবেন কি?

কেন?

না না, ও ঘরে থাকবেন না সাব। যত লোক থেকেছে সব্বাই…

এ বারলোর কেয়ারটেকার রামজনম ভেওয়ারীর কথা, তার উদ্বেগ, যচনহজী আমাদের দলের অনেকের কৌতূহল বাড়িয়ে দিচ্ছিল, মেয়েরা ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। তাই সাহস যোগাতে বললাম, রাখ তোমার লোক, যারা থেকেছে তারা লোক নয়; বল, মেয়েলোক। জেনানা। অমিয় সেন মুখ টিপে হাসল। বলল, সে চিন্তা তোমার করতে হবে না ভেওয়ারী, উনি যা বলছেন, তাই কর। তুমি ওই কোণের ঘরেই ওনার ব্যবস্থা কর ভেওয়ারীজী।

কেমন একটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভেওয়ারীজী কোণের ঘরটা আমার জন্যে খুলে দিল। অথচ এই কোণের ঘরটাই সব চাইতে ভাল। যে কোন রসিক মনের কাছে ভাল লাগাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। দক্ষিণ-জানলার কোণ ঘেঁষে দিগন্ত বিস্তৃত ধূ ধূ রুক্ষ জমি। তারই পাশে সুবর্ণরেখার মত দীর্ঘ একটা পাহাড়ী নদী। তার ডানদিকে, বেশ দূরে ধূসর বনের রেখা চোখের দৃষ্টি হারিয়ে উত্তরে হারিয়ে গেছে।

ঘরে ঢুকে জানলা খুলে দিলাম। নির্জন, নিস্তব্ধ ঘর। জোৎস্নার আলোয় বিস্তৃত খোয়াই সাদা, শীর্ণকায় নদীটা আরো সাদা। জানলাটা খুলে অনেকক্ষণ বাইরে তাকালাম। ইতিহাসের কথা বারবার মনে পড়তে। নিষ্পাপ যুবতীর পবিত্র রক্ত আর নরখাদক এমারসন সাহেবের কথা। তারপর ঘরখানার ভেতর তাকাতেই একটা বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়ল। বিশেষ করে ওই ক্যালেণ্ডারে।

সারা শরীরে কেমন একটা রোমাঞ্চ খেলে গেল। ঘরের ভেতর থেকে চোখ সরিয়ে আবার বাইরে তাকালাম। গলাটা কেমন শুকিয়ে আসছে। ঘরে তাকালেই ক্যালেণ্ডারটা দুলছে। জাপানী ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ডাইনে বাঁয়ে দুলছে। আশ্চর্য! ভাবলাম চিৎকার করে ভেওয়ারীকে ডাকি। অমিয়, কি উর্বশীকে। একবার চিৎকার করলাম। ভয়ার্ত কণ্ঠের সে চিৎকার চার দেওয়ালে প্রতিঘাত খেয়ে যেন লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। আর দ্রুতভালে ক্যালেণ্ডারটা দুলতে থাকল।

চোখে হাত চাপা দিলাম। তারপর আস্তে আস্তে চোখ বুজেই দক্ষিণের জানলা বন্ধ করে দিলাম। তবু পরিবর্তন নেই। হাওয়া নেই। অথচ দুলছে। দুলছে আর দুলছে। কাঁচের গ্লাসে জল রেখেছিল ভেওয়ারী। গ্লাসটা হাতে তুলতেই দেখলাম জল নেই। শূন্য গ্লাসটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরা। কোন উপায়ে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে চোখ বুজে নিঃসাড়ে শুয়ে পড়লাম। আর শুকুনি দক্ষিণের জানলার পরদাটা কে যেন খুলে দিল।

কী একটা ভয়, একটা আতঙ্কে সারা শরীর হিম। জিভটা পেটের ভেতর কে যেন টেনে আনছে আমার। তারপর সেই অবস্থাতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা ঠিক মনে নেই।

যখন জাগলাম, সকাল হয়ে গেছে। বিস্তৃত খোয়াই পার হয়ে শুচ্ছ শুচ্ছ ঠাণ্ডা বাতাস আসছে দক্ষিণের জানলায়। ঘরের সমস্ত জানলা খুলে দিলাম। ঘরখানাকে ভাল করে প্রত্যক্ষ করলাম। কিন্তু নেই। দেওয়ালের সেই রহস্যময় ক্যালেণ্ডারটা ছাড়া কোথাও কিছু নেই।

সারা ঘরখানা আবার দেখলাম ভাল করে। মাত্র সাদাসিধে একটা ক্যালেণ্ডার রঙ-বেরঙের জড়োয়া গয়নার ছবি দেওয়া নিতান্ত তুচ্ছ একটা ক্যালেণ্ডার। যার মধ্যে একটা নেকলেসের ছবি, আর কিছু আংটি এবং চুড়ির ডিজাইন।

একটু পরেই দারোয়ান ঘরে ঢুকল। উৎসুক দৃষ্টি। বলল, রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল বাবুসাব?

না হবার কী আছে? হয়ত এ উত্তরটা আশা করেনি ভেওয়ারী। নিজের দুর্বলতা যথাসম্ভব গোপন করে বললাম, কোন অসুবিধা হয়নি, ভেওয়ারীজী, ভালই ঘুমিয়েছিলাম।

বেশ বুঝতে পারলাম ভেওয়ারীজী সেই উৎসুক দৃষ্টিতে আমাকে প্রত্যক্ষ করছে। অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তারপর কিছু না বলে চলে গেল ভেওয়ারীজী।

উর্বশী ঢুকল। পেছনে আমার প্রধান সহকারী অমিয় বোস। উভয় কৌতূহলে দুজনেই প্রায় একসঙ্গে উচ্চারণ করল, ভেওয়ারীজীকে সত্যই আপনি নার্ভাস করে দিলেন।

ভাবলাম ঘটনাটা বলি। তবুও ভাবলাম আর কিছুদিন অপেক্ষা করি। আমার মত যাদুকরের পক্ষে ঘটনাটা এরই মধ্যে ফাঁস করে দেওয়া হয়ত উচিত হবে না।

ততক্ষণে দক্ষিণের জানলা দিয়ে সকালের রোদ ঢুকেছে ঘরে। দূর পাহাড়ের গায়ে, বন-বোপের শরীর ছুঁয়ে সোনালী রোদ আরো স্পষ্ট, আরো উজ্জ্বল হয়ে ঠিকরে পড়ছে বিদ্যুৎ খোয়াই-এর ওপর।

সকালের খাবার নিয়ে এই ঘরেই ঢুকল ভেওয়ারী। পেছন পেছন আমার দলের সুকুর, রামরতন আর দেবশ্রী। হয়ত ভেওয়ারীর কাছে ওরা কিছু শুনে থাকবে। ওরা দেখছিল আমাকে। হতধাক। অপলক দৃষ্টি আমার শরীরে নিবদ্ধ। অমিয় লঘু করতে চাইল যেন অবস্থাটা। বলল, কিগো ভেওয়ারীজী, কী যেন আছে না এ ঘরে?

ভেওয়ারী শুধু হাসল।

সন্ধ্যার হাওয়ার আবার মুখোমুখি বসলাম ক'জনে। গল্প করছি, আমাদের নতুন খেলার প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করছি, হঠাৎ কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে ঘরে ঢুকল ভেওয়ারী।

বললাম, বলো।

একটু ইতস্তত করল ভেওয়ারী। বললাম, বল না, কী বলতে চাও, বল।

কেমন একটা ভয়, কেমন একটা সংকোচে ও আমাকে দেখল। শুধু বলল, আজও কি এ ঘরে থাকবেন বাবুসাব?

ওর কথাকে আমল না দিয়ে, উত্তর গলায় উচ্চারণ করেছি, কেন, না থাকার কী আছে?

না থাকলেই পারতেন। ভেওয়ারীর গলায় অনুনয়ের সুর। আর কিছু না বলে, ধীর পায়ে চলে যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়াল সে। তাহলে থাকবেন? ভেওয়ারী যেন শেষবারের মত আমাকে অনুরোধ করল। তারপর বের হয়ে গেল।

ভেওয়ারী চলে গেলে আমরা হাসাহাসি করলাম ক'জনে। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে যে যার ঘরে শুতে গেলাম।

চক্কিশঘরো আলো জ্বালিয়ে গেছে ভেওয়ারী। ঘরে ঢুকে সুইচারের বোতামগুলো প্রথমে পরীক্ষা করলাম। তারপর বিছানার ওপর বসতেই আবার সেই দৃশ্য।

একটা আলোর রেখা একবার লাল, একবার নীল হতে হতে ক্যালেন্ডারের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। পরক্ষণেই আংটি আর চুড়ির ডিজাইন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। শুধু জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকল নেকলেসটা।

প্রথমে দুহাত দিয়ে চোখ চাপা দিলাম। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এল আর সে হাওয়ার ফুস্ করে আলোটা নিভে গেল।

ভাবলাম চিৎকার করে উঠি। কিন্তু চেষ্টা করেও কোন কথা ফুটল না মুখে। চোখ চেপে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু না ঘুম, না জাগরণের মাঝখানে রাতটা ফর্সা হয়ে এল।

ভোরের আলো ফুটতেই ভেওয়ারী আবার ছুটে এল। তেমনি উৎসুক দৃষ্টিতে যেন কিছুক্ষণ কটাক্ষ করল। তেমনি বিনয়ে জিজ্ঞাসা করল আবার, কাল ঘুমোতে পেরেছিলেন বাবুসাব?

কেন বল ত? সেই কলটি ভবিষ্যতে ভেওয়ারীকে আবার বিদ্রূপ করলাম। ঘুমোবনা কেন?

ভেওয়ারী হতভম্বের মতো আমাকে আরো কিছুক্ষণ দেখে চলে গেল।

ভেওয়ারী চলে যেতেই তাকালাম ক্যালেণ্ডারে। উর্বশী ঢুকল। বলল, কী দেখছেন, নেকলেসের ডিজাইন ?

বললাম, না। কবে মাসাই ফেরা যায় তাই একটা তারিখ দেখব ভাবলাম। কিন্তু ক্যালেণ্ডারটা যে কোন সালের তা বোঝা শক্ত। লেখা-টেখাগুলো বয়সের ভারে অস্পষ্ট, কিন্তু কি স্পষ্ট ভেতরের ডিজাইনটুকু। বিশেষ করে ওই নেকলেসটা।

টুকিটাকি চিন্তার ভেতর, কী একটা উদ্বেগে সারা দিনটা কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যা হতেই গা-টা কেমন শির শির করে উঠল। তারপর যথা সময়ে শুতে এলাম।

খাটের ওপর বসে একটা সিগারেট ধরাতে গেলাম। আর দেশলাই জ্বালতেই মুখখানা বলসে গেল আমার। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটটা পড়ে গেল মুখ থেকে। জ্বলন্ত কাঠি থেকে একটা আলোর রশ্মি ঘুরতে ঘুরতে ক্যালেণ্ডারের সামনে এসে থামল। হঠাৎ নীল তারপর লাল হল। কী আশ্চর্য, আর ঠিক তখনি ক্যালেণ্ডারটা উল্টে গেল।

সাহসে ভর করে তবু চোখ রাখলাম ক্যালেণ্ডারে, একটু আগে নেকলেসটার ওপরে কে যেন কতকগুলো আগুনের ফুলকি বসিয়ে দিয়েছিল।

ক্রমশ ঘরটা কেমন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, উত্তাপ আমি স্পষ্ট যেন অনুভব করতে পারছি। চিৎকার করে উঠলাম। সে চিৎকারে ঘরটা কাঁপল। আলোটা নিভিয়ে দিলাম কোন উপায়ে। তারপর সেই উত্তাপের যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা আজও আমি ভেবে মনে করতে পারি না।

ভেওয়ারীর ডাকে পরের দিন ঘুম ভাঙল আমার। সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। ভাবলাম, ভেওয়ারীজীর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই। পরক্ষণেই, আমার সম্মান, আমার আত্মমর্যাদা, আমাকে বাধা দিল। ভেওয়ারীজী কিছু বলবার আগেই বললাম, যা ঘুম হচ্ছে না এ ক'দিন! ভেওয়ারীজী কিছু না বলে খানিকক্ষণ দেখল আমাকে। তারপর চলে গেল।

দেখতে দেখতে অথচ তিনদিন কেটে গেছে। কোন কাজ হয়নি এতদিন। দুপুরের দিকে উর্বশী আর অমিয়কে ডাকলাম। বললাম, ওদের খবর দাও, আজ একটা নতুন খেলার পরীক্ষা করা যাক।

সবাই এসে গেল। একটু পরে সকলে তৈরী হলে উর্বশীকে মিডিয়াম করবার জন্য চেয়ারে বসালাম। অমিয় আমার পাশে এসে দাঁড়াল। উর্বশীর দেহে একটা মৃত আত্মা আনবার চেষ্টা করলাম। উর্বশীর মাথা আস্তে আস্তে ঢলে পড়ল।

কিন্তু একি ?

চমকে উঠলাম আমি। চিৎকার করে উঠলাম—গৌতমা ? অমিয় আমাকে জড়িয়ে ধরেছে তৎক্ষণে। কিন্তু এখন বিভ্রান্ত হবার সময় আমার নয়। কণ্ঠশ্বাসে সকলে অপেক্ষা করে আছে। উর্বশীর পরমায়ু আমার ওপর নির্ভর করছে। একটু ত্রুটি হলে উর্বশীকে আর হয়ত আমাদের মধ্যে ফিরে পাব না। তাই পলকমাত্র গৌতমাকে দেখেই আত্মাকে মুক্তি দিলাম আমি

প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে ভেওয়ারীর ঘরে ছুটে গেলাম। জড়িয়ে ধরে বললাম, কিচ্ছুটি লুকিওনা ভেওয়ারী, কি হয়েছে বল ?

ভেওয়ারী উধাও তাকাল।

না, না, বল। আমি ভেওয়ারীজীকে একটা ইঞ্জেকশন দিলাম।
ভেওয়ারীজী বলল, খুন।

খুন?

হাঁ, বাবুজী, খুন। ভেওয়ারীর ঘর পাস।

খুন? গৌতমা, ওঃ পালিতের মেয়ে গৌতমা খুন হয়েছে? সারা শরীরে কেমন একটা শিহরণ জাগছে আমার। আমি দেখতে ভুল করিনি তো? পরখ করার জন্য ভেওয়ারীজীকে বললাম, আচ্ছা, কী রকম দেখতে ছিল বলতো?

না, ভুল করেনি ভেওয়ারীজী। বললাম, ঠিকই বলেছ ভেওয়ারী জী। বিবরণে তোমার এতটুকু গরমিল নেই।

এতক্ষণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে যাদুকরের কাহিনী শুনছিলাম। বিস্ময় আমারও কম ছিল না। তাই কাহিনীর মাঝপথেই আমি যাদুকরকে প্রশ্ন করে বললাম, কেমন করে দেখলেন?

দেখুন, একটু বিশ্মিত তাকালেন যাদুকর। বললেন, স্পিরিট ছাড়া কোন জরুরী খেলা দেখানো কোন যাদুকরের পক্ষেই সম্ভব নয়। উর্বশীকে যখন আমি মিডিয়াম করি, তখন উর্বশীর দেহে অপর একটা আত্মা ভর করে। হিপ্‌নোটাইজড মিডিয়াম তখন যা বলে তা সে আত্মারই উক্তি। কারণ মৃত মানুষের আত্মা জীবিত মিডিয়ামের সাহায্যেই আবির্ভূত হয়। কারণ, আত্মার বিনাশ নেই। উর্বশী বলেছিল ঠিকই, কিন্তু উর্বশীর পরিবর্তে আমি দেখছিলাম গৌতমাকে, আর আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিচ্ছুরিত ছটা নেকলেসের ওপর গিয়ে পড়ত, যুক্তিহীন আত্মা বলতে চাইলো, ওটাই হল তার মৃত্যুর কারণ।

অবিশ্যি এ সব আমি মিডিয়ামকে জিজ্ঞাসা করলেই পেয়ে যেতাম, কিন্তু তাহলে হয়ত উর্বশীকে ফিরে পাওয়া কষ্টকর হ'ত।

With Best Compliments from :

★
★★

M/s C. K. STEEL (P) LTD.

65/1 G. T. ROAD, LILOOAH
HOWRAH

দুপুরের রহস্য

অমিতাভ চক্রবর্তী

দেওয়ালের দু'পাশে পা ঝুলিয়ে বসে ভন্টু হজমি খাচ্ছিল। ছোটদির কাছ থেকে হজমি আদায় করা যত সহজ কাজ নয়। কেন যে দিদিরা ছোট ভাইদের দেখলেই দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে, ভন্টু ভেবে কূল পায় না। হজমি খেতে খেতে, না কি চাটতে চাটতে, ভন্টু সেই কথাটাই ভাবছিল। এখন দুপুর ক'টা? কুম্ভকর্ণের স্টাইলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মেজজেঠু এইমাত্র দু' দু'বার নাক ডাকলেন। তাহলে বেলা ক'টা এখন? বোধহয় দুপুর দেড়টার কাছাকাছি। এরকম একটা জটিল অঙ্ক মেলাতে পেরে ভন্টু মনে মনে খুশি হল। এমন সময়—

—এ্যাই ভন্টা···

কে যেন ফিসফিসিয়ে ডাকল। আর ডাকটা ভন্টুর কানে ঠিকই পৌঁছলো। কোথা থেকে ডাকটা আসছে তার হদিশ করতে ভন্টু ঘাড় বেঁকিয়ে পেছন ফিরে তাকাল। দেখল, নন্তু লাউ ডগাটির মতো দেয়ালে লেপ্টে আছে। দুই ঠোঁটে আঙুল। চোখে দুষ্টুমির হাসি। নন্তুকে এই অবস্থায় দেখে ভন্টু নিঃশব্দে একগাল হাসল। ততক্ষণে নন্তুর নজরে পড়েছে ভন্টু যেন কি একটা চুষে চুষে খাচ্ছে।

—কী খাচ্ছিস রে?

—হজমি।

—ইস্। দারুণ খেতে না রে?

—একটুও আর নেই রে?

—নেই? যাঃ।

ভন্টু দেওয়ালে ঘোড়সওয়ার হয়ে হজমি খাচ্ছিল বটে, কিন্তু আজ তার মন ভালো নেই। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ। আগামীকাল ইস্কুল খুলে যাচ্ছে। ইস্কুল খুললে প্রত্যেক সিরিয়ডে কেমন যেন একটা পড়াশোনার ব্যাপার থাকবেই। এটা ভন্টুর একেবারে পছন্দ নয়। কিন্তু মন খারাপ হওয়ার আসল কারণ, ইস্কুল খুললেই হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবে। আর যত গণ্ডগোল সেখানেই। অন্য পরীক্ষায় ইচ্ছে করলেই গোল্লা এড়ানো যায়, কিন্তু অঙ্ক পরীক্ষায় গোল্লা থেকে কিছুতেই রেহাই নেই।

ভন্টুর অঙ্কের মাথা খারাপ নয়। ঠিক কতদিন পরে আম পাকবে, একসঙ্গে ক'টা পেয়ারা খেলে নির্ঘাৎ পেটের অসুখ, বড়দার রোদ-জ্বর সারতে ক'দিন লাগে, এসব হিসাব সে নিমেষে করে ফেলতে পারে। কিন্তু নবেন স্যারের অঙ্কের খাতায় তার অঙ্ক বরাবরের বরাদ্দ দু' টাকা সাইজের রসগোল্লা। এবার কি অন্য রকম কিছু হবে! কপালের লেখা। ওই হতভাগা গোল্লা কি আর ভন্টুকে ত্যাগ করবে! এটার উদ্ধার কি সে হবে?

লাফ দিয়ে ভন্টু নামল তার দেওয়াল-সিংহাসন থেকে। হাফ-প্যান্ট হাতের ধুলো নন্তুর মাথার ঘষতে ঘষতে ক্লাস সেভেনের ভন্টু বলল, মনটা খুব খারাপ রে নোনতা।

—কেন? কি হলো?

নন্তু ততক্ষণ হাফপ্যান্টের শোক খানিকটা সামলিয়েছে।

—তোরও মন খারাপ হওয়া উচিত নোনতা।

—কেন? মন খারাপ হবে কেন?

—কাল স্কুল খুলছে তো?

—হ্যাঁ।

—তাহলেই তো হয়ে গেল আর কি। তখন থেকে খুব হ্যাঁ হ্যাঁ করে যাচ্ছিস। অঙ্কের পোল্লাটা তো এবারও আমাকেই পেতে হবে। তুইও কি আর বাদ যাবি?

বলতে বলতে ভন্টু যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ে। নন্তু প্রথমটা যেন ঘাবড়ে যায়। সত্যি বলতে কি, পরীক্ষা-টরীক্ষা, তারপর রেজাল্ট, রেজাল্ট মানেই সেটাকে ঝামেলাই ব্যাপার—কারুর কানমলা, বাবার রাম-গাট্টা! উঁহুঁ। ভাবা যায় না। এতদিন ভাবেনি। ছুটিটা বেশ কাটছিল। এখন ছুটি ফুরোলো। কাল থেকেই আবার দুঃখের দিন।

দুঃখের দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে নন্তু যেন মিইয়ে পড়ল।

কোন কিছুই কিন্তু নন্তুর মনে বেশিক্ষণ লেগে থাকে না। ওরা দেওয়ালের দিক থেকে সরে আসে। রাস্তার ধারে একটা আমলকি গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল। ঠিক সময় দেখাকোলা ঘুড়ির মতো একটা চিল দুপুরের আকাশ চিরে ঘুরে মিলিয়ে গেল। নন্তুর চোখ পড়ল। ডানুনি মন আনচান করে ওঠে। মনে পড়ল, ভন্টুর সঙ্গে যাবার কথা ছিল—

—এাই ভন্টা, বালিশখানার মাঠে যাবি?

—বালিশখানার মাঠ? সে তো অনেক দূর।

—ধ্যাৎ! কোথায় অত দূর, এই তো মোটে এক কিমি হবে।

—কী হবে সেখানে গিয়ে?

—অমিতদের বাগানে আমগাছে এখনও অনেক আম। চল যাই।

—না বাবা। অমিতদের বাগানের ওই মালীটা ভীষণ গুণ্ডা। একবার যদি ধরতে পারে, হাড় গুঁড়িয়ে দেবে।

—ধ্যাৎ! ধরতেই পারবে না। আমাদের কেউ ধরতে পারে? ভন্টা, তুই ধরা পড়ে যাবি বোকার মতো?

ওই এক কথাতেই কাজ হলো। ভন্টু অঙ্ক পরীক্ষা ছাড়া আর কোথাও হারতে জানে না। হারবার পাত্রই নয় সে।

—চল তবে।

ভন্টু পা বাড়াল। নন্তু পাশে। ইটের ভাঁটা, তালপুকুর, কবরখানা, কেলে কেষ্টোর আখড়া পার হলে তবে বালিশখানা মাঠের শুরু। বিশাল মাঠ। কেন যে এই মাঠে চাষবাস হয় না, তা কেউ জানে না। চারদিকে নারকাল বনে কেতের মাঝখানে কচ্ছপের পিঠের মত উঁচু বালিশখানার মাঠ। বছরে একবার এখানে চড়কের মেলা হয়। মাঠের শেষে দক্ষিণে অবশ্য গ্রাম আছে। বেশ বড় গ্রাম। গ্রামের শুরুতেই অসিতদের বাগান।

অসিত আর সুনীত দুই ভাই একই ক্লাসে পড়ে ভন্টুদের সঙ্গে। অসিতদের সঙ্গে দু'-একবার গিয়েছে নন্তু ভন্টু ওদের বাগানে। কিন্তু বাগানের ওই গুঁপো মালিটা কেন জানি ভন্টুকে দু'চোখে দেখতে পারে না। একদিন ভন্টু একা একা গিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল দি'দুরে পেয়ারা বাগানো। তা ওই হতচ্ছাড়া মালী 'ভাগো হিঁয়াসে' বলে এমন তাবে তেড়ে এলো, ইচ্ছে না থাকলেও ভন্টুকে পালিয়ে আসতে হলো। ন'মামা বলেছেন, য পলায়তি স জীবতি। পালানো মানে হেরে যাওয়া নয়।

বালিশখানার মাঠে পা দিয়েই ভন্টুর যেন কেমন মনে হলো। মাথার উপরে কোপাকুপি ঝলমলে সূর্য। আকাশ আশ্চর্য নীল। দূর লাগানো বাতাস। এইসব নিয়ে বিশাল মাঠটা বড় চুপচাপ। তবু ভন্টুর নাকে অন্য রকম গন্ধ লাগে।

—মোনতা অসিতদের বাগানে না যাওয়াই ভালো রে।

—কেন?

—যদি কিছু গোলমাল হয়?

—তুই ওই গুতো গুঁপো মালীটার কথা ভাবছিস?

ভন্টু চুপ করে থাকে। আসল কথাটা ঠিক তাই। কিন্তু মুখ ফুটে সেটা বলতে আটকাচ্ছে।

—কিচ্ছু হবে নারে ভন্টা। ব্যাটা টেরই পাবে না। ভন্টু নাক টানে। গন্ধ পায়। কেমন যেন অন্য রকম লাগে।

ওরা বাগানের যে দিকটায় এসে দাঁড়াল, মালীর ঘর তার ঠিক উল্টো দিকে। মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা। বাগানের ধারে এসে ভন্টুর অন্য মূর্তি। সে তখন গাছের আম ছাড়া আর কিছুই দেখছে না। আম বাগানো ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারছে না। এসব কাজে ভন্টু অভিজ্ঞ। একটু পরেই দেখা গেল ভন্টু এ ডালে এক পা, অন্য ডালে আর এক পা রেখে লম্বা বৈঁকিয়ে হাত লম্বা করে টপাটপ আম ছিঁড়ে নিচ্ছে। আর নির্ভুল নিশানায় গাছের নিচে একটা একটা করে ছুঁড়ে দিচ্ছে নন্তুর হাতের মুঠোয়। নন্তু যেন কার্ভ লিপে দাঁড়িয়ে ক্যাচ ধরছে।

কেবল গাছের পাতার ভন্টুর হাত লেগে একরকম খসখস শব্দ ছাড়া কোথাও আর কোন আওয়াজ নেই। বাগানের গুঁপো মালীর কথাও আর ওদের কারো মাথায় নেই। নন্তু কেবল যথেষ্ট আম পাড়া হয়েছে। বেশী লোভ করতে নেই। মেয়দার সংস্কৃতের বইয়ে লেখা আছে।

—ভন্টা, নেমে আয়।

—চুপ। ওই ডালটা সাবাড় করি।

—আর দরকার নেই। অনেক হয়েছে রে। নেমে আয়।

—দাঁড়া আর ক'টা হলেই—

ঠিক এই সময়ই নন্তর সেই ক'পো গুণ্ডা মালীর কথা মনে পড়ল। নন্তু উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

—এ্যাই ভণ্টা, নেমে আয়। মালী এসে যাবে। ভণ্টুর হুঁশ হয়। তাই তো, মালী গেল কোথায়। এক্ষুনি ঠিক এসে যাবে। হুড়মুড় করে নামতে গিয়ে ভণ্টু আম পড়ার মতো ধপাস করে এসে মাটিতে পড়ল। হাঁটুতে বেশ লেগেছে। এখন ওসব ভাববার সময় নেই। পকেটে হাতে যে যতগুলি পারল আম নিয়ে বাগান পেরোতে গিয়ে পড়ল একেবারে বাঘের মুখে।

অসিতের বাবা।

পরনে খুতি। তার উপর কতুয়া। ডান হাতের গুলিতে বাঁধা সোনার মাদুলি। ঘন কালো কোঁকড়া চুল। কিন্তু মাথা ঝকঝকে মোটা গোঁফ। গোঁফের পাশ দিয়ে পেছনে দেখা যাচ্ছে আরও একজোড়া কালো কুচকুচে মিলিটারী গোঁফ, লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে ওই গুণ্ডা মালী।

—আম চুরি করতে এসেছ কেন?

ভণ্টুরা তো আগেই ভয়ে সব আম ফেলে দিয়েছে মাটিতে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। বুকের মধ্যে কেমন যেন হু'কোর গুড় গুড় গুড় গুড় আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

—তোমরা কোত্থেকে এসেছো?

ওদের মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না।

—তোমাদের নাম কি?

নন্তু এবার নাম বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজের নামটা মনে পড়ল না। ভণ্টুর মনে হলো, আমগুলোও অঙ্কের খাতায় গো ।।

এর পরই ঘটল একটা অদ্ভুত কাণ্ড। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠল। ঝড়ো বাতাস সব এলোমেলো হয়ে গেল। পাগলা হাতির মাথা নাড়ার মতো গাছগুলি দাপাদাপি শুরু করে দিল। সোঁ সোঁ শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। ধুলোয় চোখ খুলে রাখাই দায়।

—বাড়ি যাও তোমরা।

ঝড়ের দাপাদাপির মধ্যে ওরা অসিতের বাবার গলা ঠিকই শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ভণ্টু আর নন্তু এক দৌড়ে বাগান পেরিয়ে অনেকটা দূর চলে আসে। ওইভাবে প্রাণপণ ছুটে আসতে গিয়ে ওদের দম ফুরিয়ে যায়। একটু থামে। নন্তু একবার পেছন ফিরে বাগানের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে যায়। এর মানে?

ব্যাপারটা আরও ভালো করে বোঝবার জন্য নন্তু একবার আকাশে চোখ মেলল। কী আশ্চর্য! নন্তুর বিস্ময় ক্রমে বাড়তে থাকে। এমন হয় কী করে? নন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না। ব্যাপারটা যে খুবই গোলমেলে, তা সে বুঝতে পারে। একটু সময় নিয়ে ভণ্টুর দিকে তাকায়। ভণ্টু এতক্ষণ পর আমের শোকে ঁকিয়ে উঠল।

—ইস। আমগুলো সব ফেলে আসতে হলো। এত কষ্ট করে পাড়লাম।

—রাখ তোর আম। এদিকে কী কাণ্ড চলছে ভেবে দেখেছিস?

—কেন? কী হলো?

—একটু আগে আমরা যখন আমবাগানে ছিলাম, তখন ঝড় উঠেছিল না ?

—উঠেছিল। দারুণ ঝড়।

—এখন তাই ঝড় নেই।

—থেমে গেছে। তাই নেই।

—ওই রকম সাংঘাতিক ঝড় এত অল্প সময়েই থেমে গেল ? তা কখনও হয় ?

—হুঁ।

—তা ছাড়া তাখ আকাশ কি রকম পরিষ্কার। এক টুকরো মেঘ কোথাও নেই। একটু হাওয়া পর্যন্ত নেই। এখানে ঝড়ের কোন চিহ্নই নেই।

—হুঁ। কেমন কেমন হয়ে যাচ্ছে যেন।

—ঝড় কি কেবল আমবাগানেই হলো ? এমন ঝড় আবার হয় না কি ?

—তাই তো, বড্ড গোলমেলে ব্যাপার।

ভণ্টু এবার খুব মন দিয়ে গোলমেলে ব্যাপারের রহস্য ভেদের চেষ্টা করতে লাগল। যতই চেষ্টা করে, গোলমাল ততই পাকিয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সবই এমন এলোমেলো হয়ে যায় যে, অসিতের বাবাকেও কেমন অন্যরকম লাগে।

—নোনতা, একটা জিনিষ কিন্তু অদ্ভুত লাগল।

—কী ?

—অসিতের বাবা মানে জ্যেঠামশাই আমাদের চিনতে পারেন নি।

—তাই তো। সেই জন্যই তো উনি নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

—কিন্তু আমরা তো ওঁর অচেনা নই। তাহলে চিনতে পারলেন না কেন ?

—বোধহয়, ইচ্ছে করেই চিনতে পারেন নি।

—দূর। তা হবে কেন ? নিশ্চয়ই এর মধ্যেও কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে।

আবার সেই গোলমাল। কিন্তু গোলমালটা যে কী, ভণ্টু বা নন্তু কেউই তার হদিশ পায় না। মাঠের মধ্যে উবু হয়ে বসে দু'জনে ভাবতে থাকে। একটা কথা মনে পড়ে গেল। আর অমনি ভণ্টু উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

—নোনতা, তোর জন্যই যত ঝামেলা।

—তার মানে ?

—তোর কথাতেই তো আজ এখানে এলাম। আর এসে যত গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে পড়লাম।

নন্তু উত্তর দেয় না। মাথা নিচু করে বসে থাকে। ভণ্টুও চুপচাপ। কী করবে এখন ? বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা মনে হল। সেই কথাটাই নন্তুকে বলবে ভেবেছিল, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল অন্য কথা।

—এ্যাই নোনতা, বৃষ্টি হচ্ছে না কি রে ?

—বৃষ্টি ? কোথায় ?

নন্তু আকাশের দিকে চোখ তোলে। নন্তুকে দেখে ভন্টুও আকাশে চোখ রাখে। ঝকঝকে নীল আকাশ। তখনও কত্তা রোদ। আকাশ থেকে চোখ সরানোর আগেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল।

—দেখলি তো নোনতা ?

ভন্টু দৌড় শুরু করল।

—দৌড়চ্ছিস কেন ভন্টা ?

—ওই যে পোড়ো বাড়িটা দেখছিস, চল ওখানে যাই। নইলে একদম ভিজে যাব।

—এখানে আবার বাড়ি কোথায় রে ?

—ওই তো। ছাদ না।

তাই তো! অবাক কাণ্ড!

দৌড়ে গিয়ে বাড়িটার বারান্দায় উঠল। একটা এক তলা পোড়ো বাড়ি। পাতা। পুরনো দিনের কড়ি বরগার ছাদ। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গিয়ে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। দেওয়াল ফুঁড়ে উঠেছে বটগাছ। চারপাশ ঘিরে ছোট ছোট জঙ্গল। কেমন যেন ভুতুড়ে বাড়ি মনে হয়।

মাথার জল ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবনায় পড়ে। হঠাৎ করে এখানে একটা পোড়ো বাড়ি গজাল কী করে।

—ভন্টা, এখানে এ রকম একটা বাড়ি আগে ছিল জানতিস ?

—আগে তো কখনও দেখিনি। যা খুশি হোক। এখন তো আছে। বৃষ্টিতে আর ভিজতে হবে না।

—কিন্তু যা ছিল না তা যদি হঠাৎ করে এসে পড়ে, তাহলে কেমন গোলমেলে ব্যাপার হয় না।

—উফ্। আবার গোলমাল। যা ছিল না তা কি কখনও হতে পারে না ?

—হবে না কেন ? অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু তাই বলে ফাঁকা মাঠের মধ্যে পোড়ো একটা বাড়ি হঠাৎ করে গজিয়ে উঠতে পারে ?

—হুঁ। তাহলে অন্য একটা কথা।

—কী রে ?

—আকাশে এক কোঁটা মেঘ নেই। হঠাৎ বৃষ্টি। তুমুল বৃষ্টি। কেমন যেন—

—গোলমেলে কাণ্ড তাই না ?

—হুঁ।

এর পর আর কোন কথা হয় না। ভন্টু এদিক ওদিক তাকিয়ে বাড়িটা দেখছিল। বারান্দা

পেরিয়ে গেলেই ঘর। সেন বোঝা যায়। এগিয়ে দেখারও খুব ইচ্ছে। কিন্তু এ সব বাড়িতে ঘরের ঘরেই সাপ খোপ থাকে। ভূতও থাকতে পারে। ভন্টু তাই মনের ইচ্ছা মনে চেপে রাখে।

নন্তও ভাবছিল একবার ভেতরে গিয়ে দেখলে হয় না? এ রকম বাড়িতে অনেক সময় বেনরুপ পাওয়া যায়। মেজদা যখন পড়ার টেবিলে বসে গল্পের বই পড়ে, তখন ও লুকিয়ে দেখছে ওই ছবিটা। ওরই বয়সী একটা ছেলে টিচ ছেলেছে আর তার আলোয় কত হীরে মুক্তো পান্না ঝিকমিক করছে।

—আই ভন্টা, জানিস এরকম বাড়িতে কত গুপ্তধন থাকে?

—লাখটাকাও থাকে। বাঘও থাকতে পারে। এমন কি—

ভন্টু কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই পলেস্তরা খসা দেওয়াল কাঁপিয়ে কার যেন গলা ভেসে এল।

—তোমরা কে?

গলার আওয়াজ শুনেই নন্তর ভিরমি খাওয়ার উপক্রম। ঝটিতে সরে এল। ভন্টুর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ভন্টু তখনও মুখ হাঁ করে তাকিয়ে আছে খোলা দরজার দিকে।

—তোমরা কে? এগিয়ে এসো।

আবার সেই রকম ভাঙাচোরা গলা। ওরা উত্তর দিল না। কিন্তু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। ইচ্ছে করে নয়, যেন ওই গলার আওয়াজ সাঁড়াশি হয়ে চেপে ধরে ওদের নিয়ে যাচ্ছে। ওরা বারান্দা থেকে দরজা পেরিয়ে ঢুকল একটা বড় ঘরে। আবছা অন্ধকারে ঠাহর ঘরের মাঝ বরাবর আসতেই আবার হুকুম এল, এবার ডান দিকের দরজার কাছে এসো। ওরা তাই করল। ডান দিকের দরজাটা বন্ধ। এবার কী করবে? দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকবে? ভাবতে হল না। তার আগেই সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দরজার সামনে এসে দাঁড়া তোরা।

ওরা দাঁড়িয়েই ছিল। দাঁড়িয়েই রইল। এই সময় ভন্টু ফিস ফিস করে নন্তকে বলল, এখন আমাদের তুই করে বলছে যে। আমাদের চেনে না কি?

—ভন্টু, তুই এখানে এসেছিস কেন?

আশ্চর্য! ভন্টুর নামও জানা আছে। ভীষণ অবাক হয়। এবার ওর ভয় অনেক কমে গিয়েছে।

—আমি একা আসিনি। আ-আমার সঙ্গে—

—জানি তোর সঙ্গে নন্তও এসেছে।

—আপনি আ-আমাদের চেনেন?

আমি সবাইকে চিনতে পারি। আমি সব জানি। বল, তোরা কি জানতে চাস?

দুই বন্ধু পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী জানতে চাইবে? কী জানতে চাওয়া যায়? নন্ত ফিস ফিস করে ভন্টুকে বলল, এটাও একটা ভীষণ গোলমেলে ব্যাপার না রে?

—হ্যাঁ। থাকুন রহস্যময়।

দু'জনেই একটু থতমত খেয়ে যায়। সব কথাই শুনে ফেলেছে। ফেলেছে।

—বল তোরা কী জানতে চাস?

—আচ্ছা, হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় ভন্টা কত নম্বর পেয়েছে?

—জানি। ভন্টু পোল্লা, নম্বর দুই।

এর পর সেদিন আর কীকী ঘটেছিল, তার দরকার নেই এই গল্পে। তবে সেদিন ওরা নিরাপদেই বাড়ি ফিরেছিল। আর কোন গোলমেলে ব্যাপারে পড়তে হয়নি।

পরদিন।

টিফিনে স্কুল থেকে ফেরার পথে দুই বন্ধুতে কথা হচ্ছিল। রেজাল্ট বেরিয়েছে। আশ্চর্য! অঙ্কে ভন্টু চিরকালের মতো এবারও পোল্লা পেয়েছে। নম্বর যেন কী করে দু' নম্বর ছুটিয়েছে।

ভন্টা, কালকের ওই লোকটা কী করে জানল আমাদের নম্বর টম্বর?

—কী জানি। সবটাই কেমন রহস্য রহস্য।

□

With best compliments from :

★★
★

Phone 65-5640

AMIT CASTINGS

144/145 J. N. Mukherjee Road
Ghusuri, Howrah

জীবনটা যে রকম

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

আকাশটার রঙ নীল নীল, ঘাসটা সবুজ, সূর্যের আলোর রঙটা কি ? সোনালী ঝলমলে—সব রঙ তাতে চেনা যায়। আর নিথর কালো অন্ধকারের জগৎটার কোন রঙ নেই—কালো সাদার ফারাক নেই, আলো আঁধারির তফাৎ নেই।

এই একরঙা পৃথিবীটায় যারা বেঁচে থাকে তারা স্পর্শ, ঘ্রাণ, শ্রবণ, আস্বাদন—এই চারটি ইন্দ্রিয়-নির্ভর হয়ে ওঠে। তাদের স্ব-নির্ভরতা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কলকাতায় ও তার আশ-পাশের শহরতলীতে বহু সংস্থা আছে যারা অন্ধত্বের জালে আটকানো এই ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা, মানুষ করে তোলার ভার নিয়েছে।

এইরকম একটি সংস্থা ওয়ার্কশপ্ ফর দ্য ব্লাইণ্ড। উত্তর কলকাতার সীমানা ঘাঁষিয়ে ঝমঝম স্টেশনের ধার ঘেঁসে, রুক্ষ এক চিলতে খেলার মাঠের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ছোতলা ইংরেজী নকশার বাড়ীটা। টানা লম্বা বারান্দাটার রেলিঙের শিকগুলো কবে ভেঙে পড়ে গেছে কেউ জানে না। ছোতলার ওঠার সিঁড়িটায় পা রেখে ভয় হয়, বুঝি বা পায়ের চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে।

এই বাড়ীতে তারা থাকেন তুলসী নারায়ণ চক্রবর্তী। অন্ধাশ্রম। তাঁর পুরো পরিবারের সবাই-ই প্রায় বিধাতার এই নিষ্ঠুর পরিহাসের শিকার। নিজেরা একটি ঘরে থেকে অন্য দুটি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন ওয়ার্কশপের জন্যে। আশ্চর্য মানুষ তুলসীবাবু। তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন এই সংস্থাটিকে। অন্ধ দুঃস্থ ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় করে। অন্ধকারের মধ্যেও পথের নিশানা দেবার চেষ্টা করেন তাদের। অতি নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই বেশীর ভাগ আসে এই ছেলেমেয়েরা। অন্ধকারে ভৈরবী প্রাচীর ভেঙে তাদের একটা নতুন জীবনের সঙ্গীত শোনাতে চেষ্টা করেন এই কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ তুলসীবাবু।

তাঁকে এই কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন অনেকে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর সমাজসেবামূলক কাজ করার তাগিদেই তাঁরা আসেন। এঁদের মধ্যে আবার অনেকে নিজেরাই প্রতিবন্ধী কেউ একটা চোখে হয়ত সামান্য অবহা অবহা দেখেন। এরকমই একজন বিশ্বনাথ মুখার্জী। অন্ধত্ব তাঁদের পরিবারের রক্তে। ধীরে ধীরে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন পরিবারের সবাই। ফুলের মত ছোট নিষ্পাপ মেয়ে তাঁর, বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দুচোখে নেমে এসেছে সাদা পর্দা। অপারেশন করানো দরকার এক্ষুনি, কিন্তু টাকা কোথায় ? সে নিজে না দেখতে পেলেও তাকে সবাই দেখেছে রুপোলী ছোট পর্দায়। সূত্রের মাধ্যমে ভরিয়ে তুলেছিল কয়েকটি ক্ষণ। বিশ্বনাথ-বাবুর ছোট্টো হং-চুন-সুরকীর যা-হোক একটু কারবার ছিল। যথা সময়ের মধ্যে টাকা জোগাড় করে উঠতে না পারায় সরকারী ট্রেড্ লাইসেন্স রিনিউ করা হল না। যাচ্ছলে এ বিষয়ে কোনো-রকম লোন দেয় না, আবেদনকারী প্রতিবন্ধী হলেন। ঐ চোখে দেখতে না পাওয়া কিশোরী মেয়েটার ভবিষ্যৎ যে এবারে সত্যিই হতাশার তিমিরে ডুবে গেল। তার বাবা যে বেকার, অন্ধ।

কিন্তু বিশ্বনাথবাবু তাঁর কর্তব্য পালন করে চলেছেন বিস্ময়কর একাগ্রতার সঙ্গে। ওয়ার্ক-শপের বাড়ীর একাংশ ভেঙে পড়ল। বারান্দার রেলিং খসে পড়ল নিচে, আর তার সঙ্গে মিটকে

নিচে নিয়ে পড়ল ওয়ার্ডশপের একটি প্রতিবন্ধী ছেলে, নাম শিবনাথ। মাধ্যমিক পাশ করেছিল অঙ্কে লেটার নিয়ে। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে কি আশ্চর্যভাবে যে সে প্রাণে বাঁচল। পরমাণু তার অনেক বলেই হয়ত।

বিশ্বনাথবাবু নিজের দুঃখ হাহাকার ভরা ভবিষ্যৎ ভুলে ছুটলেন টাকার সন্ধানে। টাকা চাই। টাকা। অনেক টাকা। নইলে আর কত শিবনাথ না জানি কখন, পরম নিশ্চিত বিশ্বাসে, জীবনের অন্ধকার থেকে মরণের অন্ধকারে পা বাড়িয়ে দেবে।

ওয়ার্কশপের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সবাই দেখেছে সুন্দর বাড়ির মডেলটি—যেটা নাকি গড়ে উঠবে সরকারের বদান্যতায় পাওয়া সল্ট লেকের জমিতে। সেই খরচের রকম বেশ কয়েকটি সংস্থা ও মহানুভব ব্যক্তিদের কাছ থেকে টাকা আসছে, আসবে, "হেল্প এজ" থেকে। কিন্তু সে টাকার কোনো অংশই খরচ করা যাবে না দমদম রোডের ওয়ার্কশপের সাহায্যে—না বাড়ীর মেরামতিতে, না তার জীর্ণ চার দেওয়ালের মধ্যে কর্ম বা পাঠরত প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েগুলির জন্যে। সল্ট লেকের ঝিমঝাম বাড়ী এখনও সুদূর স্বপ্ন। তাকে বাস্তবায়িত করতে এই ছোট্টো সংস্থাটির পক্ষ থেকে যেতে হয়েছে ভিক্ষা চেয়ে হবে আরও অনেকবার অনেকের কাছে।

তাই, ওয়ার্কশপের টাকা থেকেও নেই। বিশ্বনাথবাবুদের ভাই বলিয়া হয়ে, নাওয়া/খাওয়া/বিশ্রাম ভুলে রাস্তার রাস্তায় ঘুরতে হয়। আন্দাজে আন্দাজে বাসে-ট্রামে চড়তে হয় প্রয়োজন মাফিক। একদিকের মেরামতি কাজ শুরু করতে না করতেই ভেঙে পড়েছে অন্য দিকটি। ভাগ্য ভাল পথচারীরা কেউ আহত বা নিহত হননি। আর ভাগ্য ভাল সেই ছেলেমেয়ে কটির যারা হাত ও আঙুলের অদামাল সামঞ্জস্যে নিবিষ্ট চিত্তে সেই হুতশ্রী ভাঙা ঘরে বসে বুনে চলেছে নানা-রকমের টুকরি, ঝাপি, মোড়া, চেয়ার নক্সাদার পাপস বা তৈরী করছে সাদা পেনসিল চক। ভেলে আঙুল রেখে গভগভ করে পড়ে যাচ্ছে অনেকে।

শিবনাথকে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ভর্তি করে দিয়েছেন বিশ্বনাথবাবু বারাসত কলেজে। "ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ আমার যাইই হোক না কেন, কিন্তু তো কাজ সবার জন্যে করতে পারছি। আজকে আমার বড় আনন্দের দিন।" খোঁচা খোঁচা আধপাকা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে তাঁর মুখটা অদ্ভুত আনন্দের অভিব্যক্তিতে ভরে যায়; প্রায় দৃষ্টিহীন চোখের কোণে চিক চিক করে ওঠে কয়েক ফোঁটা জল।

□

With Best Compliments from :

DEE KEY STEEL

109/1 GIRISH GHOSH ROAD

BELURMATH, HOWRAH

IRON & STEEL MERCHANTS

অপরূপা গোয়ায় ঃ কয়েক দিন

পল্লব মিত্র

ভারতবর্ষের ভূখণ্ডের মধ্যে বহু উল্লেখযোগ্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করবার মত দর্শনীয় স্থান আছে। এর মধ্যে কয়েকটি স্থানে প্রায় সারা বছর ধরে বহু ভ্রমণার্থীর আগমন ঘটে, এবং সেই ভ্রমণার্থীর মধ্যেও যে গুটিকয়েক স্থানে পৃথিবীর বিভিন্ন আগ্রহী পর্যটকদের পদার্পন ঘটে, গোয়া সেই অল্প সংখ্যক উল্লেখযোগ্য স্থানের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে যদিও স্বর্গ কাশ্মীর, কিংবা মোহময়ী আন্দামানের মত গোয়ার জনপ্রিয়তা সাধারণের মধ্যে ততটা প্রচারিত হয়নি। তাসত্ত্বেও আমার মনে হয় ভারতবর্ষের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি দেখার সুবাদে, আমার মতে ভারতের পশ্চিম উপকূলের এই সুন্দর স্থানটি যেটি বর্তমানে একটি স্বাধীন রাজ্য, সেই গোয়া নিঃসংকোচে দেশের এবং বিদেশের পর্যটকদের কাছে প্রকৃতই একটি অতি মনোরম দর্শনীয় পর্যটন স্থান।

ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য গোয়া। ১৯৮৭ সালে ভারতবর্ষের ২৫ তম রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে। এর আগে এই গোয়া অঞ্চলটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত হত। উত্তরে মহারাষ্ট্র, পূর্ব ও দক্ষিণে কর্ণাটক, আর পশ্চিম ভাগটি জুড়ে রয়েছে আরব সাগরের নীল জলরাশি। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে, নদ-নদী, পাহাড় সমুদ্র এই তিনটিরই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে এই গোয়া রাজ্যে। সব-কিছু মিলিয়ে প্রকৃতির রূপ প্রত্যেক স্তরে স্তরে শোভা পাচ্ছে গোয়ার দিক দিগন্তে।

১৫১০ সালে সেই সময় কোচিনের পর্তুগীজ গভর্নর আলফেনসো মাত্র ১২০০ সৈন্য ও কয়েকটি ক্ষুদ্র জাহাজ নিয়ে গোয়ার প্রধান নদী মাণ্ডী নদী অতিক্রম করে মূল গোয়ায় প্রবেশ করে এবং স্থানীয় আদীল শাহীদের যুদ্ধে হারিয়ে সেই পর্তুগীজ সৈন্যরা পুরনো গোয়ার শাসনভার গ্রহণ করে। স্বাভাবিক কারণেই শাসক বদলের ফলে বহু প্রাচীন মন্দির ও মসজিদ ভেঙ্গে বড় বড় গীর্জা তৈরী হল। শাসকদের সঙ্গে সঙ্গে বহু ধর্মীয় যাজকরা গোয়াতে এসে হাজির হলেন এবং অন্যান্য স্থানের মত সেই স্থানে ব্যাপক হারে ধর্মান্তরিত হল গোয়াবাসী। শুরু হয়ে গেল রোমান ক্যাথলিকদের জয়যাত্রা। সেই পথ চলা চলতে লাগল প্রায় দীর্ঘ সাড়ে চারশো বছর ধরে। এবং পর্তুগীজ শাসকরাই এই দীর্ঘ সময় ধরে সমগ্র গোয়া অঞ্চলের শাসনভার নিজেদের হাতে করায়ত্ত রেখেছিলেন। এরপর ১৯৬১ সালে স্বাধীন ভারত সরকার তাঁদের নিজস্ব সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দীর্ঘ অভিযান চালিয়ে গোয়াকে পর্তুগীজদের শাসন থেকে মুক্ত করে। প্রায় বাধ্য হয়ে ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৬১ সালে বিদেশী পর্তুগীজ শাসকরা ভারত সরকারের কাছে গোয়ার ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে। সেই সময়ে অবসান হল দীর্ঘদীনের পর্তুগীজের শাসন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, পর্তুগীজরা দীর্ঘদিন ধরে শাসন করার জন্য গোয়ার রাস্তাঘাট, চার্চ, পুরনো ঘরবাড়ী সবই পর্তুগীজ মানসিকতার গড়া। যার সঙ্গে আমাদের ভারতীয় স্থাপত্যকলার একেবারেই মিল নেই। গোয়ার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সুদীর্ঘ প্রায় ১০০ কি. মি. রুপালী সমুদ্র বেলাভূমি এবং তার পাশে পাশে উঁচু উঁচু পাহাড় দিয়ে সব ঘেরা। এরই মাঝে মাঝে সমস্ত বিখ্যাত চিত্তহরণকারী সী বীচগুলির নাম আজ অনেকের কাছে পরিচিত, যেমন, কালানগুটে, অঞ্জুনা, কোলভা, ভোনাপাওলা প্রভৃতি। এবং বহুকাল ধরেই এই সী বীচগুলির পাশে পর্যটনের সমস্ত আধুনিক ব্যবস্থাগুলি থাকার জন্য

বহুদিন ধরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিদেশী পর্যটকেরা সরাসরি গোয়ায় এসে অবসর কাটাতে ভালোবাসে। একটি সরকারী তথ্য থেকে জানা গেছে যে, বিদেশী পর্যটকদের থেকে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করার ক্ষেত্রে গোয়ার স্থান প্রায় প্রথম সারিতে। এই গোয়ার রাজধানী হচ্ছে পানাজী। এর আয়তন ৩৮১৫ বর্গ কি. মি., লোক সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ, কোঙ্কনী মাতৃভাষা হলেও মারাঠী, পর্তুগীজ এবং ইংরাজী, হিন্দী এইসব ভাষাগুলি গোয়াতে বেশ সচল। গোয়ার লোকজন বেশ মিষ্টভাষী, চালচলনে এবং কথাবার্তায় ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান জায়গার সঙ্গে রেলপথে, জলপথে এবং বিমান পথে যোগাযোগ গড়ে উঠেছে, বোম্বে থেকে পুণা হয়ে সাউথ মেন্ট্রাল রেলওয়ে পুণে মিরাজ কোলাপুর, ভাস্কো ডা গামা, বাঙ্গালোর প্রভৃতি সাধার ট্রেনে গোয়াতে আসা যায়, গোয়ার নামে কোন স্টেশন নাই। স্টেশন থেকে নামতে হয় মারগাঙ্গ। এই মারগাঙ্গ থেকে সোজা বাসে করে পানজীতে আসা যায়। এ ছাড়া, সড়কপথে বোম্বাই, বাঙ্গালোর প্রভৃতির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আছে, বোম্বাই থেকে গোয়ার দূরত্ব প্রায় ৫৯৩ কি. মি. বোম্বে থেকে গোয়াতে বাসে আসতে সময় লাগে প্রায় ১৬ ঘন্টা, এছাড়া সিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া সপ্তাহে ৩ দিন বোম্বে থেকে পানাজী জাহাজ চালাচ্ছে। এতে সময় লাগে বোম্বে থেকে প্রায় ১০ ঘন্টা। এছাড়া দিল্লী বোম্বে বাঙ্গালোরের সাথে আকাশপথে যোগাযোগ আছে।

১৯৮১ সালে জানুয়ারী মাসে এই প্রতিবেদককে গোয়ার কয়েকটি রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে কথা বলবার জন্য রাজধানী পানাজী যেতে হয়েছিল এবং বলা বাহুল্য বোম্বে থেকে রাতের দুপার ডিলাক্স কোচে যাবার ব্যবস্থাটি ছিল। ব্যক্তিগত সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ভারতবর্ষ এবং বিদেশের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য স্থান দেখার সুবাদে বোম্বে থেকে গোয়া যাবার সড়কপথে এই সুন্দর অভিজ্ঞতাটি প্রকৃতি প্রেমিক যে কোন দর্শনার্থীর কাছে অত্যন্ত মনোরম লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। কিভাবে যে ১৩/১৬ ঘন্টা বাসে কেটে যাবে তা মনেই হবে না। যখন ক্রমশই ভোর হবে তখন প্রশস্ত পিচ রাস্তার দুপাশে দুরবীর্ণ পর্বতমালা এবং মাঝে মাঝে ছোট ছোট নদী ওই পর্বতমালা-গুলিকে অতিক্রম করেছে এবং তার মধ্যে বিভিন্ন পাহাড়ী ফুলের গাছ সব মিলিয়ে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটি লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না।

এবার গোয়ার কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের উল্লেখ করা যেতে পারে। গোয়ার শহরের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় রাজধানী পানাজীর কথা। পানাজী হচ্ছে একটি অত্যন্ত আধুনিক সাজানো গোছানো শহর। এই শহরের নীচ দিয়েই বয়ে চলেছে মাণ্ডবী নদী, শহরের চারপাশেই শুধু জলপথ। শহরের কাছেই স্যালিটকে পাহাড়। মাণ্ডবী নদীর ওপর সম্প্রতি একটি বড় ব্রীজ হয়েছে। এতদিন পণ্ডি স্টিমারে করে যাত্রীরা এপার ওপার করতেন। ছুটির দিনে সন্ধ্যায় পানাজীতে এই মাণ্ডবী নদীতে আলো দিয়ে সাজানো ষ্টীমারে তিন ঘন্টা করে নদীবক্ষে ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে পর্যটকদের মধ্যে। সঙ্গে গোয়ার নিজস্ব লোকসংস্কৃতির নাচ ও গান পরিবেশিত হয় জাহাজে। এবং নানান রকম গোয়ার নিজস্ব বিশেষ রান্না, খাবারও বিক্রী করা হয়, এটি সত্যিই একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পানাজী থেকে ৩৪ কি. মি. দূরে শহরের প্রধান রেল ষ্টেশন, সেটি হচ্ছে মারগাঁও। এটি আবার গোয়ার দ্বিতীয় বাণিজ্য শহর। এখানে বহু প্রাচীন ঘরবাড়ী, সুন্দর সুন্দর পার্ক, এবং নানান আধুনিক দোকানপাট দেখতে পাওয়া যায়, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের সঙ্গে জাতীয় সড়কপথের মাধ্যমে এই মারগাঁওকে যুক্ত করা হয়েছে।

এর পর আর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান হচ্ছে ভাস্কো-দা-গামা, পানাজী থেকে ৩০ কি. মি. দূরে এই আধুনিক শহরটি অবস্থিত। কাছেই বিখ্যাত মারগাঁও বন্দর। চওড়া রাস্তা, ঝাকঝক সী

বীচ দিয়ে সাজানো এই শহরটি। এই ভাস্কো-দা-গামার খুব কাছেই গোয়ার একমাত্র বিমানক্ষেত্র ডাবলিন। শহরের রেলপথেরও এটি প্রান্তিক স্টেশন। এই ভাস্কো-দা-গামা শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে লম্বা নদী জুয়ারী, বাঙালীরা এই শহরে বাস করে। দুর্গাপূজার সময়ে বেশ কয়েকটি সার্বজনীন পূজা অনুষ্ঠিত হয় এই শহরে।

মারমাগাঁও বন্দর। পানাজী থেকে প্রায় ৩৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত এই স্থানটি। সদা ব্যস্ত এই বন্দরটিতে মানুষজন ও মাল আসা যাওয়া করছে সব সময়। ভারতবর্ষের মধ্যে এই মারমাগাঁও বন্দরটির গুরুত্ব অসীম। এবার আমরা শহরের বাইরে গোয়ার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমুদ্র সৈকতের খবর বলব। "কালানগুটে বীচ" পানাজী থেকে ১৬ কি. মি. দূরে এই বীচটি হল গোয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমুদ্র সৈকত। গোয়াতে বহু সমুদ্র সৈকত থাকলেও এই কালানগুট বীচটি হল প্রধান। বিদেশী পর্যটকরা বীচটিতে বেশী ভীড় করে।

সরকার থেকে তাই পর্যটকদের জন্যে সমস্ত স্তরে হোটেল অতিথিশালা, আধুনিক ব্যবস্থাদি রয়েছে, এমনকি বিদেশী কায়দায় ট্যুরিস্ট হিস্ট এবং ছোট ছোট কাঠের তৈরী কটেজ আছে সমুদ্র সৈকতের অদূরে।

"কোলভাবীচ" মারগাঁও থেকে মাত্র ৬ কি. মি. দূরে এই বীচটি অবস্থিত। সমুদ্র, বালুকা আর আকাশ এক অনবদ্য প্রাকৃতিক মিলনে মিলেছে। নারকেল গাছ দিয়ে ঘেরা এই রমণীয় বীচটিতে সারা দিন রাতই অসংখ্য পর্যটক কৌতূহলে ব্যস্ত।

"বীরমার বীচ" এই বীচটির আবার অন্য নাম পালপার ডারাস। নরম বালির সোনালী এই বীচে পদ্ম গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়ান সত্যই এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। রাজধানী পানাজী থেকে সবচেয়ে কাছে এই বীচটি, সকাল সন্ধ্যে নীল আরব সাগর যে কোন পর্যটককে হাতছানি দেয়, এ ছাড়াও অঞ্জনা বীচ, ডোনাপাওনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সমুদ্র সৈকত বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এ ছাড়াও গোয়া রাজ্যে বহু দর্শনীয় গীর্জা, বহু হিন্দু মন্দির, এবং বড় বড় মসজিদও বিভিন্ন জায়গায় শোভা পাচ্ছে এর মধ্যে সি ক্যাথিড্রাল গোয়ার সবচেয়ে বড় গীর্জা। সুদীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে এই গীর্জাটি নির্মাণ হয়েছিল। এটির স্থাপত্যকলা যে কোন পর্যটককেই মন মাতায়। এই গীর্জাটির মধ্যে ১৪টি কারুকার্য করা উপাসনা বেদী ও ৫টি ঘন্টা আছে এর মধ্যে আবার গোল্ডেন বেল গোয়ার সবচেয়ে বড় ঘন্টা এবং বিশ্বের বিখ্যাত ঘন্টাগুলির মধ্যে এটি একটি।

এ ছাড়া আরকিউলাবিকাল মিউজিয়াম, আগুসাদা দুর্গ, হুবসাগর জলপ্রপাত, ফ্রান্সেস অভয়ারণ্য, ভীমদেব মন্দির, মহালক্ষ্মী মন্দির এ ছাড়াও জামা মসজিদ ও নামাজপা মসজিদ পর্যটকদের কাছে বিশেষ দর্শনীয় স্থান।

ভারতবর্ষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সবরকমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমাহার। সমুদ্র, পাহাড়, বন ঘন, জঙ্গল কিংবা সুবিশাল মরুভূমি এই সব রকমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপই আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষে। এর অনেকগুলি রূপেরই সংমিশ্রণ ঘটেছে গোয়া রাজ্যে। তাই গোয়া সত্যিই এক অপরূপ দর্শনীয় স্থান।

□

With best compliments from

Phone : 65-5301
65-6064

SHREE R. K. & SONS

INDUSTRIAL GASES & OTHERS

Dealers in CALCUTTA OXYGEN LTD.

109 1 Girish Ghosh Road
Belurmath, Howrah
Pin Code-711 202

With best compliments from

★★
★

Phone 65-8394

TAMAL HOSIERY

All Kinds of Hosiery Goods &
Order Suppliers

NEW GANESH MANGLAHAT
HOWRAH-711 101

With best compliments from :

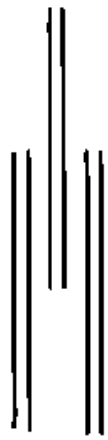

PHONE : 65-7372
65-8120
65-5939
22-8624

VINOD KUMAR GOYAL

GHUSURI
HOWRAH

TIY SAMACHINTAN, MONTHLY Sept.-Oct. 1992 Vol.-7 No. 1-2 Regn. No. 44068/86
Postal Regn. No. WB/HWH-47

With the best compliments of :-

PHONE 65-7565
65-7655
65-8739

PER FORGINGS & STEELS LTD.

82/D/2 J. N. MUKHERJEE ROAD

GHUSURY, HOWRAH-711107

11. The Librarian,
Central Library
University of
CALCUTTA - 700

Jatiya Samachintan is published by Smt. Shikha Sanyal from 97/3, Naskarpara Road, Howrah-711107 and Printed by her at Print Service, 81, Naskarpara Road, Howrah-711107